চাঁদের বুড়ির পান্তা ইলিশ

সেলিনা হোসেন

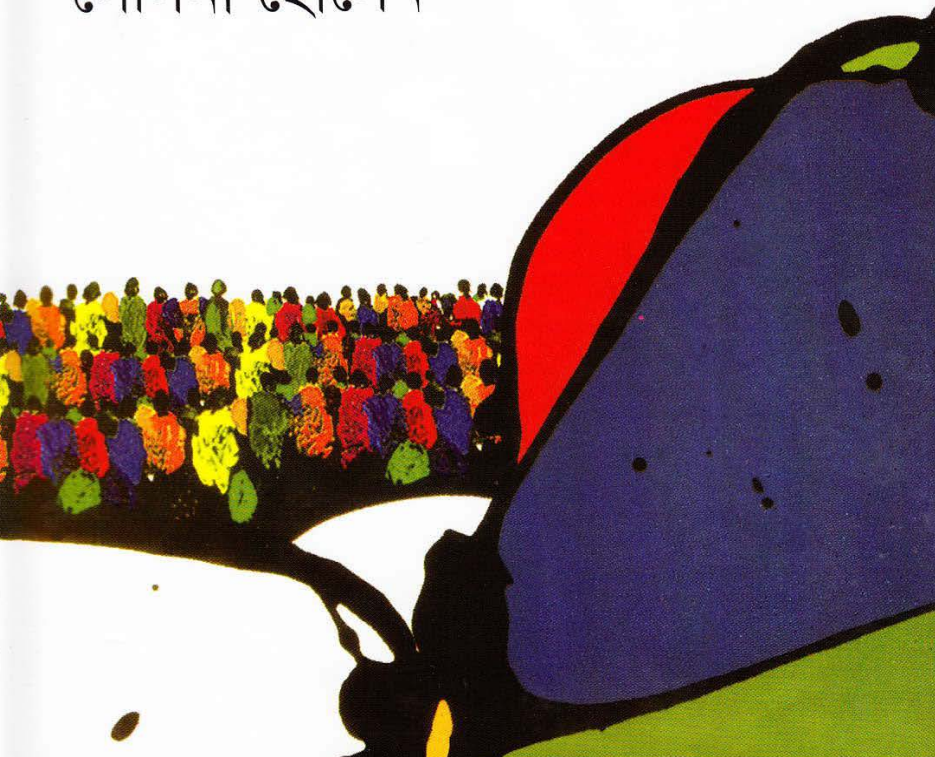

চাঁদের বুড়ির পান্তা ইলিশ

সেলিনা হোসেন

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

জনতা প্রকাশ

প্রকাশক
রফিকুজ্জামান হুমায়ুন
জনতা প্রকাশ
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৭৫৫৫৯, ০১৫৫২৪০৯১৯১, ০১৭১৮০১১২৮৭

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০০৮
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০১২

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

পরিবেশক
মুক্তপ্রকাশ
৩৮ বাংলাবাজার (২য় তলা)
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

সংগীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১০০ টাকা

ISBN : 984-653-128-1

Chander Burir Panta Ilish : by Selina Hossain. Published by Rafiquzzaman Humayun, Janata Prokash, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka. Price : Taka One hundred only.

উৎসর্গ

পূজা রোজারিও
স্বপ্ন পূরণের জায়গাটি তৈরি করবে যে

ছোটদের জন্য লেখকের অন্যান্য বই

বাংলা একাডেমী গল্পে বর্ণমালা ১৯৯৪
জ্যোৎস্নার রংয়ে আঁকা ছবি ২০০২
বায়ান্নো থেকে একাত্তর ২০০৬
পুটুসপুটুসের জন্মদিন ২০১০
গল্পটা শেষ হয় না ২০০৬
এক রুপোলি নদী ২০০৫
মিহিরুনের বন্ধুরা ২০০৪
অন্যরকম যাওয়া ২০০১
কাঁঠাল ও ইলিশ ২০১২
যখন বৃষ্টি নামে ২০০২
মেয়রের গাড়ি ২০০৩
বর্ণমালার গল্প ২০০১
আকাশপরী ২০০১
কাকতাড়ুয়া ১৯৯৬
সাগর ১৯৯১

নীল আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের বুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তখন বুড়ি একগাল হেসে বললো, তুই কে রে ছেলে?

আমার নাম নীল। পৃথিবী থেকে এসেছি।

আহারে সোনা, কতটা পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে তোকে। পৃথিবী তো এখান থেকে অনেক দূরে। খিদে পেয়েছে তোর?

তোমার কাছে খাবার আছে বুড়িমা?

আমার কাছে সব সময় পান্তাভাত আর ইলিশ মাছ ভাজা থাকে। ওই যে মাটির হাঁড়ি দেখতে পাচ্ছিস, ওটায় থাকে। কখনো খালি হয় না।

খালি হয় না কেন? রহস্য কি? তুমি কি জাদু জানো বুড়িমা? তুমি যদি জাদু জানো তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে জাদু শিখবো। পৃথিবীতে ফিরে সবাইকে জাদু দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবো। পৃথিবীর মানুষ নীলের অবাক করা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

চাঁদের বুড়ি খিলখিল করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তুই একটা বোকা ছেলের মতো কথা বলছিস। ভাবটা এমন যে এমন কথা তুই কোনোদিন শুনিসনি। তাই না?

নীল বুড়ির কথার উত্তর দেয় না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বুড়ির দিকে। বলে, তুমি এখন কি করছো? মনে হচ্ছে তুমি যা করছো সেখান থেকে নীল আলো বের হচ্ছে। তুমি আমাকে সত্যি অবাক করে দিলে।

দেখতে পাচ্ছিস না যে আমি সুতো কাটছি।

কী করবে সুতো দিয়ে? এগুলো মানুষেরই বা কি কাজে লাগবে?

মানুষের কাজেই লাগে রে বোকা ছেলে। চাঁদের আলো দিয়ে আমি চরকায় সুতো কাটি। এগুলো পৃথিবীতে পাঠাই। তবেই না চাঁদনি রাত হয়। চাঁদনি রাত পেলে মানুষের খুশির সীমা থাকে না।

সত্যি, দারুণ মজা তো। তুমি এক ভীষণ বড় জাদুকর। তোমার জাদুতে পৃথিবীতে আলো নামে।

বেশ বুঝেছিস। এখন বোস, পান্তাভাত খা।

নীল আর্মস্ট্রং বেশ বড়সড় একটি পাথরের ওপর পা উঠিয়ে বসে। বেশ লাগছে ওর। চারদিকে শত শত পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, কতো যে তার রঙ। কত যে তার আকার। নীল নুড়ি কুড়িয়ে গুনতে থাকে, ছুঁড়ে মারে–দূরে-কাছে।

একটি নুড়ি ছুঁড়ে বলে, এই সবুজ নুড়িটা আমার মায়ের কাছে যাও। মাকে গিয়ে বলো, তোমার ছেলে বলেছে, বাগানে একটি চেরি ফুলের গাছ লাগাতে।

একটি লাল নুড়ি ছুঁড়ে বলে, তুমি আমার বাবার কাছে যাও। গিয়ে বলো, তোমার ছেলে বলেছে, খামারের ভেড়াগুলোর লোম কেটে স্তূপ করতে।

একটি নীল নুড়ি ছুঁড়ে বলে, তুমি আমার ছোট বোনের কাছে যাও। গিয়ে বলো, তোমার ভাই বলেছে, লেকের পানিতে কাগজের নৌকা ভাসাতে।

একটি গোলাপি নুড়ি ছুঁড়ে বলে, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের কাছে যাও। গিয়ে বলো, তোমার ভাই বলেছে, বাগানের গোলাপগুলোর ঝরে পড়া পাপড়ি বাতাসে উড়িয়ে দিতে।

একটি হলুদ নুড়ি ছুঁড়ে বলে, তুমি আমার বান্ধবী নেলীর কাছে যাও। গিয়ে বলো, তোমার বন্ধু বলেছে, তোমার ক্যানারি পাখিটা খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে।

তখন নীল দেখতে পায় আশেপাশের অসংখ্য ছোট ছোট রঙিন নুড়ি ওর দিকে গড়িয়ে আসছে। জমতে জমতে নুড়ির পাহাড় গড়ে ওঠে।

এক একটি বলে, আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠাও নীল আর্মস্ট্রং। মানুষের কাছে যেন ভালো কথার বার্তা নিয়ে যেতে পারি। তুমি কয়জনকে চেনো নীল?

নীল ভয় পেয়ে বলে, আমি তো এত নুড়ি পাঠাতে পারবো না। আমি মাত্র কয়েকজন মানুষকে চিনি।

নুড়িগুলো চেঁচিয়ে বলে, তুমি একটা ঘোড়ার ডিম।

রঙিন নুড়িগুলো আবার গড়িয়ে চলে যায় দূরে।

নীলের মন খারাপ হয়। নুড়িগুলো ওকে ঘোড়ার ডিম বলেছে। বকা দিয়েছে। খাটো করে দেখেছে। ও কি এতই অপদার্থ! বুড়িমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

বুড়িমা পাথরের থালায় পান্তা আর দু'টুকরো ইলিশ মাছ ভাজা নিয়ে আসে। ইলিশের গন্ধে খিদে বেড়ে যায় নীলের।

কিরে মন খারাপ কেন?

নুড়িরা আমাকে বকা দিয়েছে।

দেবেইতো। বেশ করেছে।

তুমিও তাই মনে করো?

হ্যাঁ তাতো করি। করবোইতো। তুই একটা গাধা ছেলে।

নীল এবার আর মন খারাপ করে না। বুড়িমার বকা শুনে চুপ করে থাকে।

নে, ভাত খা। মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি যে খিদে পেয়েছে।

বুড়িমার হাত থেকে থালাটা নিতে নিতে নীল বলে, মাছটার কি সুন্দর গন্ধ বুড়িমা। কোথায় পেয়েছো?

বুড়ি হুঁ হুঁ শব্দ করে শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে ধরে বলে, এটা পদ্মা নদীর মাছ। নদীটা পেটের মধ্যে ইলিশ নিয়ে ছোটে।

বিস্ময়ে নীলের চোখ বড় হয়ে যায়। পান্তাভাতে হাত ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করে, পদ্মা নদী কোথায়?

হি-হি করে হেসে চাঁদের বুড়ি বলে, পৃথিবী থেকে চাঁদে এসেছিস আর পদ্মা নদীর খবর জানিস না? তুই কেমন ছেলেরে?

সত্যি বুড়িমা আমি পদ্মা নদীর কথা জানি না। আমি আমাজান, রাইন, টেমস, নীল এসব নদীর নাম জানি। উহ্, তোমার পান্তাভাত যা স্বাদ! আমার পেট ভরে যাচ্ছে, মন ভরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি এতদিন ধরে যা খেয়েছি সেগুলো এই পান্তাভাতের স্বাদের কাছে খুবই খারাপ ছিল। মনে হচ্ছে ইলিশ একটা জাদুর নদীর মাছ।

তাহলে বোঝ, যে নদীতে অমন ইলিশ হয় সে নদী কত সুন্দর।

বলো না নদীটা কোথায়? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে।

নদীটা বাংলাদেশে। ছোট্ট কিন্তু খুব সুন্দর দেশ। ছোট-বড় অনেক নদী সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে।

আমি বাংলাদেশের নাম শুনিনি। পৃথিবীর অনেক দেশের নাম আমি জানি। আমি যখন প্রথম চাঁদে নামি, মানে আমিই তো চাঁদে নামা প্রথম মানুষ, তখন তোমাকে পেলে আমি খুব খুশি হতাম।

হি-হি করে হাসে চাঁদের বুড়ি। বলে, তুই যেদিন চাঁদে নামলি সেদিন আমি তোকে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি দেখা না দিলে তুই কখনো আমাকে দেখতে পেতি না রে ছেলে।

সেবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলে আমি তোমাকে আমার দেশে নিয়ে যেতাম। তোমাকে আমার দেশের জাদুঘরে রেখে দিতাম। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ তোমাকে দেখতে আসতো

তাদের আমি বুড়ো আঙুল দেখাতাম রে ছেলে।

শুধু বুড়ো আঙুল? জিভ দেখাতে না?

না, শুধু বুড়ো আঙুল। যেন ওরা বুঝতে পারে যে আমার বুড়ো আঙুলের ওপর ওদের পৃথিবী।

ও বাব্বা! নীল বুড়িমার কথায় ভড়কে যায়। তারপর সামলে নিয়ে বলে, আমি আমার সরকারকে বলতাম, এই পাথরের ঘরের মতো একটি ঘর তোমাকে তৈরি করে দিতে। আর একটি সোনার চরকা দিতে বলতাম। তাহলে তোমার ভালো লাগতো না?

একটুও না। আমার এই পাথরের ঘর তোর ভালো লাগছে?

লাগছে, খুব সুন্দর লাগছে। কত বড় বড় পাথর দিয়ে তুমি ঘরটা বানিয়েছ। ছোট ছোট রঙিন নুড়ি দেয়ালে লাগিয়েছ। নুড়ির ওপর সুতো বিছিয়ে কি সুন্দর বিছানা বানিয়েছ। তোমার ঘরটা পৃথিবীতে আমার ঘরের চেয়েও সুন্দর।

আজ আমি তোকে নিয়ে বেড়াতে যাবো। দেখবি চাঁদের মাটি কত সুন্দর। তোর পেট ভরেছে রে?

ভরেছে বুড়িমা। এত সুন্দর খাবার আমি আর কখনো খাইনি।

তোর মা নেই? মা খেতে দেয়নি?

এতো সুন্দর খাবার মা কোথায় পাবে। মা তো অন্য রকম খাবার বানায়। সেটা খেলে তোমার এতো ভালো লাগবে না। তোমাদের খাবারের মজাই আলাদা।

দুপুরে খাবি তো?

না, সারা দিনে আমার আর কিছু খেতে হবে না। রাতেও না।

বলিস কিরে ছেলে? এখানে তো বাতাস নেই যে তুই বাতাস খেয়ে পেট ভরবি।

হা-হা করে হাসে নীল আর্মস্ট্রং। ওর হাসির শব্দ শুনে চারদিক থেকে ছুটে আসে ছেলেমেয়েরা। নীল অবাক হয়ে বলে, এরা কারা বুড়িমা?

এরা আমার রঙিন নুড়ি। শত শত নুড়ি। যে নুড়ি তুই তোর প্রিয়জনের কাছে পাঠালি এরা তারা। ওরা আমার বুকের ধন।

কোথা থেকে এসেছে?

বাংলাদেশ থেকে।

ও বাব্বা, দেশটা দেখি অনেক কিছু পারে। হ্যাঁ দেশটা যে অনেক কিছু পারে তা আমি তোমাকে দেখে বুঝেছি। বাতাস নেই, পানি নেই, তবু কেমন দিব্যি আছো এখানে তুমি। তোমাদের কি সবকিছু সয়ে যায়?

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ, আমাদের সবকিছু সয়ে যায়।

একজন বলে, আমরা পাথর দিয়ে গড়া।

অন্যজনের কণ্ঠে উচ্ছ্বাস, আমাদের গায়ে ফুলের সুবাস আছে।

আমরা না খেয়ে বছরের পর বছর থাকতে পারি।

আমরা তোমাদের মতো অন্য দেশ আক্রমণ করি না।

আমরা খারাপ কাজ করতে লজ্জা পাই।

বুঝেছি, বুঝেছি। তোমরা আমাকে আর লজ্জা দিও না।

তুমি আমাদের বন্ধু হবে?

নীল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, হ্যাঁ, বন্ধু হবো। তোমাদেরকে আমার দেশে নিয়ে যাবো।

তোমার দেশে নিয়ে যাবে? না, আমরা তোমার দেশে যাবো না। কেন আমাদেরকে তোমার দেশে নিয়ে যেতে চাও?

একজন গলা ফুলিয়ে বলে, আমরা বারবার পাচার হতে চাই না।

পাচার? পাচার কী? নীল অবাক হয়ে সবার দিকে তাকায়। তার চোখের পলক পড়ে না।

সে তুমি বুঝবে না। আমাদের মতো দুঃখ তো তোমার নেই।

তোমরা কীভাবে এখানে এসেছো?

তোমরা যে অ্যাপোলো-১১ মহাকাশ যানে চড়ে এসেছিলে, আমরাও সেটায় করে এসেছি।

কোথায় পেলে সেটা?

তোমাদের যা কিছু পুরনো, যা কিছু ফেলে দাও সেগুলোই তো আমরা ব্যবহার করি। তোমাদের পুরনো কাপড়চোপড়, পচা গম আর চাল। প্লেন, জাহাজ, গাড়ি আরো কত কি?

ওদের কথায় নীল একমুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে যায়। ওর দেশের ফেলে দেয়া জিনিসগুলো যে অন্য দেশে যায় তা ও জানে না। ছেলেমেয়েদের কাছে এসব শুনে নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। ওরা কি তাহলে সত্যি এতই খারাপ?

একজন বলে, তুমি যখন প্রথম চাঁদে এলে তখন আমাদের দেশটাকে দেখতে পেয়েছিলে নীল?

না, কোনো দেশ আমি আলাদা করে দেখতে পাইনি। আমার মনে হয়েছিল পৃথিবী একটা সীমানাহীন অনেক বড় দেশ।

বাব্বা, কী মজা, কী মজা!

ছেলেমেয়েরা হাততালি দেয়।

পৃথিবীটা একটা দেশ হলে খুব ভালো হতো। আমরা জানি তুমি যে চাঁদের ভেলায় করে এসেছিলে তার নাম ছিলো 'ঈগল'। পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর পাঁচ দিন পরে তুমি ওই ভেলাটা চাঁদে নামিয়েছিলে।

বাহ্, তোমরা তো দারুণ ছেলেমেয়ে। চলো তোমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

চলো, চলো। ছেলেমেয়েরা নীলের হাত আঁকড়ে ধরে।

ওপাশ থেকে চাঁদের বুড়ি চেঁচিয়ে বলে, এই ছেলেমেয়েরা আগে পান্তা–

হ্যাঁ, হ্যাঁ আগে পান্তা-ইলিশ।

ওরা লাফিয়ে লাফিয়ে বড় বড় পাথরের ওপর উঠে বসে।

নীল দেখতে পায় চাঁদের বুড়ির অসংখ্য হাত হাঁড়ি থেকে পান্তা-ইলিশ তুলছে আর ছেলেমেয়েদের দিচ্ছে। কখনো হাতটা অনেক লম্বা হয়ে যায়, কখনো খাটো। উঁচু অনুযায়ী হাতগুলো ছোট-বড় হয়। ওর বেশ লাগে দেখতে। ও যখন প্রথম চাঁদে নামে তখন এসব দৃশ্য ওর দেখা হয়নি। ও কাউকে খুঁজে পায়নি। মহাকাশ যানের কমান্ড মডিউলের নাম ছিলো কলম্বিয়া, আর লুনার মডিউলের নাম ঈগল। ছেলেমেয়েরা এসব জানে। এবার বেড়াতে এসে এসব ছেলেমেয়ের দেখা পাওয়া ওর বড় ভাগ্য। নীল মনের আনন্দে শিস বাজায় আর গান গায়।

একজন বলে, তুমি তোমার ভাষায় গান গাইবে না। তুমি আমাদের বন্ধু হয়েছো। তাই তোমাকে আমাদের ভাষার গান শেখাবো। দেখবে কত সুন্দর আমাদের ভাষা।

তোমরা কোন ভাষায় কথা বলছো?

বাংলা।

তোমাদের দেশ?

বাংলাদেশ। তুমি এখন আমাদের বাংলাদেশে আছো। এটাই আমাদের বাংলাদেশ।

চাঁদের বুড়ি হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, বাংলাদেশ থেকেই তো আমি হাজার হাজার বছর আগে এসেছি।

বাংলাদেশ! নীল বিস্মিত হয়। নিজে কখনো এই দেশটির নাম শোনেনি। অথচ এ দেশের লোকেরা এত অগ্রগামী যে চাঁদে পৌঁছে গেছে! ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে পান্তা-ইলিশ খাচ্ছে। এই অপরূপ দৃশ্যে নীলের চোখ জুড়িয়ে যায়। ও ভাবে, ওর দেশ এত ক্ষমতাশালী, অথচ পদ্মা নদীর মতো একটা নদী বাংলাদেশে থাকবে কেন, ওরা কি অনায়াসে নিজের দেশে নদীটা নিয়ে আসতে পারে না? প্রেসিডেন্ট বুশকে গিয়ে খবরটা দিতে হবে, যেন এই ছোট কাজটি অনায়াসে করে ফেলতে পারে। বুশ করতে পারবে না এমন কোনো কাজ তো পৃথিবীতে নেই। নীল বেশ ডাটের সঙ্গে জামার কলার নাড়িয়ে দেয়।

চাঁদের বুড়ি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, তোর এত দেমাক কিসের রে ছেলে?

আমি ভাবছি তোমাকে আমার দেশে নিয়েই যাবো। তোমাকে জাদুঘরে রাখবো না। তুমি আমার দেশে বসে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা পাঠাবে পৃথিবীর অন্য দেশে।

আমাকে তো কেউ চাঁদ থেকে কোথাও নিতে পারবে না।

আমরা পারি, আমরা তো পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দেশ।

হা-হা করে হাসে চাঁদের বুড়ি।

হা-হা করে হাসে ছেলেমেয়েরা। ওদের খাওয়া শেষ। ওরা পাথরের থালাগুলো ওপরে ছুঁড়ে মারে আর ধরে ফেলে। ওরা কোনো ব্যথা পায় না। ঐ অনায়াস খেলায় আবার বিস্মিত হয় নীল। বলে, তোমরা কোনো ব্যথা পাচ্ছো না?

ব্যথা পাবো কেন? এত আমাদের পাথরের ফুল। দেখছো না ওপরে ছুঁড়ে মারলে এগুলো কি সুন্দর ফুলের মতো ফুটে ওঠে।

নীল কিছুই দেখতে পায় না। ওর কাছে পাথর তো পাথরই। তখন চাঁদের বুড়ি নীলকে বলে, যারা চাঁদের বুড়িকে পৃথিবীতে নিয়ে যেতে চায়, তারা পাথর হয়ে যায়। একমাত্র আমিই পারি চাঁদের আলোয় তৈরি নীল সুতো দিয়ে তার জীবন ফিরিয়ে দিতে।

নীলের মুখে কথা সরে না। ও দেখতে পায় ছেলেমেয়েদের ওপর থেকে ছুঁড়ে দেয়া পাথরের থালাগুলো বুড়ি অনায়াসে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে। তারপর গুছিয়ে রাখে পাথরের ঘরের কোণায়। পান্তাভাতের হাঁড়িটা ও কোথাও দেখতে পায় না। ছেলেমেয়েরা এসে ওর হাত টেনে ধরে বলে, চলো আমরা ফুটবল খেলবো।

ফুটবল? কোথায় পাবে?

বড় একটা পাথরের ঢিবিকে ওরা ফুটবল বানিয়ে পা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আসছো না কেন? একটা লাথি দাও না। নাকি তুমি রেফারি হবে?

আমি তো তোমাদের মতো ছোট নই। আমাকে রেফারিই বানাও।

তবে এই নাও বাঁশি।

একটি মেয়ে ছোট একটি পাথরের টুকরো ওর হাতে দিয়ে বলে, ফুঁ দাও।

নীল ফুঁ দিলে সেটা রেফারির বাঁশির মতো বেজে ওঠে।

বাহ্ বেশ সুন্দর বাঁশি তো। এটা কি তোমাদের আবিষ্কার?

বুড়িমার পান্তা-ইলিশ খেলেই আমরা সব করতে পারি।

ও আচ্ছা। সেজন্য আমিও বাঁশি বাজাতে পারি।

শুরু হয়ে যায় ফুটবল খেলা। নীল অন্তহীন বিস্ময়ে নিজেকে রেফারি হিসেবে আবিষ্কার করে ওদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে।

ভাবে, ভাগ্যিস ও চাঁদের দেশে এসেছিলো। নইলে তো এমন খাঁটি-পাথুরে দেশটাকে এমন করে দেখা হতো না।

বাড়ি থেকে পালিয়েছে দুই কিশোরী, তোয়া আর পুপা। ওদের ইচ্ছে ওরা দু'জনে পৃথিবীটা ঘুরে দেখবে। ওদের নিজেদের এলাকা ঢাকার মিরপুর, এর বাইরে সবটাই ওদের পৃথিবী। দু'জনে মায়ের কাছে বকুনি খেয়েছে নিজেদের হাজারো কৌতূহলের জন্য। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে ওদেরকে ঢোকানো হয়েছে রান্নাঘরে, মায়েরা গার্মেন্টসে চাকরি করে, বাবারা রিকশা চালায়। কিন্তু এই বয়সে রান্নাঘরে ঢোকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তোয়া আর পুপার নেই। দু'জনেরই বয়স এগারো বছর। রান্নার কাজ সামলে ভাইবোনদের ভাত খেতে দিয়ে বাবা-মায়ের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে ওরা হাঁফিয়ে ওঠে। বাড়িটাকে মনে হয় বন্দীশালা। তাই দু'জন একদিন সকালবেলা বাবা-মা কাজে বেরিয়ে গেলে পালায়।

দু'জনের কাছে সামান্য কিছু টাকা ছিলো। সেটা কোমরে গুঁজে নেয়, আর পলিথিন ব্যাগে নেয় জামাকাপড়। ওদের চলে যাওয়া বাড়ির কেউ খেয়ালই করে না। ওরা বাসে উঠে সাভার আসে। বাসের কন্ডাক্টর ওদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাবে?

ওরা কথা বলে না। চুপ করে থাকে। ওরা তো জানে না কোথায় যাবে। ওরা তো ঘুরতে বেরিয়েছে।

এই তোমরা কথা বলছো না যে?

চটপটে তোয়া আঙুল নেড়ে বলে, আমাদের যেখানে খুশি সেখানে যাবো। তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন? অ্যাঁ?

আরে বাব্বা, এ যে দেখছি ত্যাড়া মেয়ে। নামো, বাস থেকে নামো বলছি। শেষে পুলিশ এসে তোমাদেরকে ধরবে।

অ্যাঁ...পুলিশ ধরবে, পুলিশের কত সাধ্য। আমরা কি চুরি করেছি নাকি যে পুলিশ ধরবে। পুলিশ তোমাকে ধরবে।

ভারী জ্বালায় পড়লাম তো। নামো, নামো বলছি।

পুপা তোয়ার হাত টেনে বলে, আয় নেমে যাই।

দু'জনে বাস থেকে নেমে চারদিকে তাকায়।

আমরা কোথায় এসেছি রে?

বোধহয় মালয়েশিয়ায়।

নাকি দুবাইয়ে?

কোনো একটা দেশ হবেই। আমাদের আত্মীয়স্বজনরা তো হয় মালয়েশিয়ায়, নয় দুবাইয়ে কাজ নিয়ে যায়। আমরাও নিশ্চয় খুঁজলে একটা কাজ পাবো। বাসাবাড়ির কাজ তো পাবোই। কী বলিস পুপা?

পুপা মাথা নাড়ে, ঠিকই বলেছিস।

দু'জনে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে যায়। দুপুরে কিছু খাওয়া হয় না। যে কটা টাকা আছে তা চট করে খরচ করতে চায় না। দু'জনে ঠিক করে একেবারে রাতে কিছু খেয়ে নেবে। ওদের ভীষণ ঘুম পায়। ওরা হাঁটতে হাঁটতে সাভার থানার সামনে আসে। গেট দিয়ে ঢুকতে চাইলে সেন্ট্রি ওদের পথ আটকায়।

এই তোমরা কে?

আমি তোয়া ও পুপা।

কোথায় যাবে?

ভেতরে।

কেন? ভেতরে তোমাদের কী কাজ?

আমরা ঘুমাবো।

ঘুমাবে? তোমরা কোথায় এসেছো?

মালয়েশিয়ায়।

সেন্ট্রি চোখ কপালে তোলে, তোমরা কি জানো এটা সাভার থানা? বাড়ি থেকে বের হয়েছ কেন?

আমাদের ইচ্ছা হয়েছে তাই বের হয়েছি। এত কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?

কিন্তু তোমরা যাবে কোথায়?

আমরা এখানে থাকবো, এই মালয়েশিয়ায়। আমরা কাজ করবো, টাকা কামাবো, ঘুরে বেড়াবো।

ওরে বাব্বা, এ যে দেখছি আচ্ছা ত্যাঁদড় মেয়ে।

ওরা দু'জনে সেন্ট্রির কথায় কান না দিয়ে হনহনিয়ে থানার ভেতরে ঢুকে যায়। থানার বারান্দার কোণে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ে। খিদা এবং ক্লান্তিতে ওরা অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে। সেন্ট্রি ওদের আর বিরক্ত করে না।

ভোরবেলা ওরা নিজেদেরকে দেখতে পায় চাঁদের বুড়ির পাথরের ঘরে। বুড়িমা তখন চরকা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। নীল সুতোর আলোয় চারদিক মায়াবী হয়ে আছে। তোয়া উত্তেজিত হয়ে বলে, পুপা দেখ দেখ কি সুন্দর দেশে এসেছি।

ওমা, তাই তো, এটা কোন দেশ রে?

চাঁদের বুড়ি ওদের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলে, এ দেশের নাম বাংলাদেশ।

বাহ, কি সুন্দর নাম। কিন্তু তোমাকে দেখতে চাঁদের চরকা কাটা বুড়ির মতো লাগছে। তুমি তো অনবরত চরকায় সুতো কাটো।

হ্যাঁ, কাটি তো। কাটি বলেই তো পূর্ণিমার আলো হয়।

তুমি আমাদের চরকায় সুতো কাটা শেখাবে?

শিখবি? না শেখানো যাবে না।

কেন? শেখাবে না কেন? তুমি মরে গেলে তখন কে সুতো কাটবে?

আমি মরবো না।

ওমা, এটা কেমন কথা? কেউ কি এভাবে বাঁচতে পারে?

তোরা কি পান্তা-ইলিশ খাবি, নাকি পটরপটর করবি?

আমরা পান্তা-ইলিশ খাবো। আমাদের ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ওই যে থালা আছে, নিয়ে আয়।

ওরা থালা আনলে বুড়িমা ওদেরকে পান্তা-ইলিশ দেয়।

ভাতের গন্ধে দু'জনের খিদে চড়চড়িয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, ওমা পোলাওর গন্ধ। বুড়িমা পোলাও-রোস্ট রেঁধেছে।

চাঁদের বুড়ি মৃদু হাসে। ও তো জানে, ওর হাঁড়িভরা পান্তা-ইলিশের স্বাদ এমন। যে যেভাবে খেতে চায় সে সেই স্বাদ পায়। কেউ মনে করতে পারে দুধভাত খাচ্ছে, কেউ খিচুড়ি, কেউ আলুভর্তার সঙ্গে ঘি-ভাত এমন সবকিছু। কিংবা হালুয়া, ফিরনি, পুডিং, কেক-বিস্কুট আরো কত কী। মাছ-মাংস-শাকসবজির অভাব তো নেই-ই। কেবল ইচ্ছে করলেই হয়।

তোয়া আর পুপা ধীরেসুস্থে অনেকক্ষণ ধরে খায়। এত চমৎকার খাবার, তার ওপর আবার থালাভর্তি, ওরা জন্মের পর থেকে কোনদিন খায়নি। ওদের বাবা-মায়ের এসবের সাধ্যই নেই। নুন আনতে পান্তা ফুরালে তারাই বা কী করবে।

পুপা তোয়াকে বলে, ভাগ্যিস বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। তাইতো এতকিছু জুটলো কপালে। বুড়িমা তোমাকে কী বলে যে–

আমাকে কিছুই বলতে হবে না। যা চাঁদের দেশটা ঘুরে আয়।

কোন দিকে আগে যাবো?

যেদিকে খুশি।

আমরা তোমার কাছে থেকে যেতে চাই বুড়িমা।

আমার কাছে থাকবি কেন? এটা তো তোদেরই দেশ।

তাহলে আমাদের বাবা-মা কৈ?

খুঁজে দেখ কোথাও না কোথাও আছে।

নাহ্, তুমি সব গুবলেট করে দিচ্ছো। তোমার কাছে একটু বসি। তুমি আমাদের গল্প বলো।

ঠিক আছে, বোস।

তুমি কি দিয়ে সুতো বানাচ্ছো তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

চাঁদের বুড়ি হা-হা করে হাসে। সে হাসিতে মুক্তা ঝরে। দু'জনে কোঁচড় ভর্তি মুক্তো কুড়োয়। যেটাই ধরে সেটা থেকেই রুপালি আলো চমকায়। তোয়া আর পুপা আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়। বলে, এগুলো দিয়ে আমরা মালা গাঁথবো। তুমি হাসলেই কি মুক্তো ঝরে বুড়িমা?

না, সব হাসিতে ঝরে না। তোদের মতো মেয়েদের পেলেই ঝরে।

আমাদেরকে তো সবাই দুষ্টু মেয়ে বলে। বাবা-মা বকাবকি করে। বলে, আমরা বখে গেছি।

ওরা তোদের বুকের ভেতরটা দেখতে পায় না, এজন্য বলে। কিন্তু আমি তোদের বুকের ভেতর দেখতে পেয়েছি।

সত্যি বুড়িমা!

দু'জনেই বুড়ির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গলা জড়িয়ে ধরলে দেখতে পায় ওরা দু'জনে মায়াবী আলোয় ডুবে গেছে। যে সুন্দর কিছু দেখার জন্য ওরা বাড়ি থেকে পালিয়েছিল, সেই সুন্দর কিছুর দেশ এটা– তবে কেন মাঝে মাঝে এমন খারাপ হয়ে যায়, তখন যে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। এই তো সেদিন স্বপ্না বখাটেদের উৎপাত সইতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে মরে গেল– ক্লাসে ফার্স্ট হতো ও, দেখতে কী সুন্দর ছিল, মনে হতো ওর চোখ বুঝি বিলের জলের মতো টলটল করছে। তবে ও মরবে কেন? কেন ওর বাবাকে সন্ত্রাসীরা ধরে নিয়ে যায়, কেন জেলে ঢোকায়, কেন বিচার পায় না ওর বাবা, কেন ওর বাবা কাজ করতে করতে হাড্ডিসার হয়ে যায়, কেন ওর ভাইবোনেরা স্কুলে যেতে পারে না– কেন, কেন করতে করতে তোয়া আর পুপার হেঁচকি ওঠে। চাঁদের বুড়ি ওদের বলে, যারা দেশটা চালায় তারা খুব ইবলিশ রে। ইবলিশগুলো এখন আর স্বর্গে নেই, ওরা বাংলাদেশে সরকার বানিয়েছে টাকা কামাই করতে। তোদের এসব ভাবনার কেউ উত্তর দেবে না। তোরা খেলতে যা, গিয়ে দেখ ছেলেমেয়েরা ফুটবল খেলছে, ওদের সঙ্গে নীল আছে।

নীল কে বুড়িমা?

ও সেই মানুষটা যে প্রথম চাঁদে নেমেছিল। সে এখন চাঁদে বেড়াতে এসেছে।

হুররে, তার কথা আমরা বইয়ে পড়েছি। যাই তাকে দেখে আসি।

তোয়া আর পুপা দু-তিন লাফে বড় বড় পাথরগুলো ডিঙিয়ে ছুট দেয়। এখানে জল নেই, বাতাস নেই, তারপরও কী সুন্দর লাগছে চারদিক। যেদিকে তাকায় সেদিকেই মায়াবী আলো, সেই আলো চোখে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়। ওরা সেই আলো দু'হাতে নিয়ে গালে মাখে। তোয়া বলে, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে পুপা?

বলতে পারবো না।

কেন পারবি না?

তুই এখন আসল তোয়া না। অন্য রকম।

ভালোই তো। আমি আসল তোয়া থাকতে চাই না। শুকনা, গালভাঙা, ঠোঁট কেটে যাওয়া, পায়ে নোংরা, ময়লা কাপড় পরা তোয়া আমি আর থাকতে চাই না পুপা। যদি আমি অন্য তোয়া হয়ে যাই তো ভালোই হয়।

কিন্তু আমার মনে হয় যখন এই মায়াবী রঙ উঠে যাবে তখন তুই আবার আগের তোয়া হয়ে যাবি।

বোধহয় তাই, আমাদের রেহাই নেই।

চাঁদের বুড়ি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দেশ থেকে ইবলিশগুলোকে তাড়াতে পারলেই রেহাই আছে।

শুনছিস বুড়িমার কথা। আমরা যেখান থেকেই কথা বলি না কেন সেটা বুড়িমা শুনতে পায়।

আমাদেরকেও বুড়িমার কাছ থেকে জাদু শিখতে হবে।

ওরা দেখতে পায় যে সামনে ফুটবল খেলছে ছেলেমেয়েরা। ওরা দৌড়ে গিয়ে নীলের কাছে দাঁড়ায়। নীল খেলা শেষের বাঁশি বাজিয়েছে।

হুররে আমরা জিতেছি।

না, কোনো দলই জিতেনি। খেলায় কোনো গোল হয়নি।

আমরা তো গোল দিয়েছি!

আমরাও দুটো গোল দিয়েছি।

ছাই দিয়েছিস।

শুরু হয়ে যায় দুই দলের মারামারি।

তোয়া আর পুপা ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে, তোরা এখানে এসেও মারামারি করছিস!

কেন করবো না? এই লোকটা আমাদের মাঝে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে। লোকটা ক্যাচাল লাগানোর মাস্টার। ও একটা বাজে রেফারি।

নীল পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসে। ভাবে ওর দেশ তো এভাবেই রাজনীতি করে। ক্যাচাল লাগিয়ে তা বছরের পর বছর জিইয়ে রাখে। তারপর দাপটের সঙ্গে মাতবরী করে। এসব তো ওর শেখা। তাহলে ও কেন এই শিক্ষা এখানে কাজে লাগাবে না। এভাবেই তো দেশের বিস্তার ঘটাতে হয়। চাঁদে অন্যরা এসে মাতবরী করবে এটা তো হতে দেয়া যায় না। ছেলেমেয়েদের খেলাও নিয়ন্ত্রণ করা ওদের দায়িত্ব। কিন্তু তোয়া আর পুপাকে দেখে নীল ভুরু কুঁচকোয়। মেয়ে দুটো বেশ সাহসী। অনায়াসে মারামারির মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। ছেলেমেয়েরা ওদের কথা শুনেছে। এরা তো ডেনজারাস মেয়ে। নীল একটু শঙ্কিত হয়। একটু এগিয়ে ওদের হাত ধরে বলে, তোমরা কোথা থেকে এসেছো?

এটা তো আমাদেরই দেশ। তুমি আমাদের দেশে অবৈধভাবে ঢুকেছিলে।

নীল হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তোমরা বেশ মজার মেয়ে। চলো আমরা ঘুরতে যাই।

কোথায়?

যেদিকে আমার ইচ্ছে সেদিকে তোমাদেরকে নিয়ে যাবো।

তা হবে না। যেদিকে আমাদের ইচ্ছে হবে, আমরা তোমাকে সেদিকে নিয়ে যাবো।

নীল প্রথমে ভুরু কুঁচকায়। তারপরে হাসে। বলে, তাহলে তোমরা যাও, আমি এখানে বসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই পাথরটার গায়ে হেলান দিয়ে বসো। আমরা তোমাকে পাথর চাপা দিয়ে রাখি।

মানে?

মানে, পাথরের নিচে শুয়ে তুমি দেখবে যে পাথরের ফুলগুলো কী সুন্দর করে ফুটতে থাকে।

নীল গম্ভীর হয়ে বলে, না, এসব দেখার সাধ আমার নেই। তোমরা যেদিকে যাচ্ছিলে, যাও।

রাগ করেছো?

নীল খেঁকিয়ে বলে, যাও বলছি।

তাহলে আমরা যাবো না। আমরা তোমার সঙ্গে গল্প করবো। বোস, বোস। আমরাও বসছি।

ওরা হাত ধরে নীলকে বসিয়ে দেয়। বলে, রেগে গিয়ে লাভ নেই। আমরা তোমার বন্ধু না।

তবে কী?

কিছুই না। তুমিও মানুষ, আমরাও মানুষ।

তোমরা একটা ছোট্ট দেশের মানুষ। আমি একটা বিরাট দেশের মানুষ।

ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে বলে, তাতে কী হয়?

তোয়া বিজ্ঞের মতো বলে, কী আর হবে, বড় দেশ ছোট দেশ থেকে চুরি করবে।

চুরি? নীল রেগে যায়। আমরা চুরি করি না।

চুরি না করলে, ডাকাতি করো। তোমরা দস্যু।

সুর করে বলতে বলতে ছেলেমেয়েরা নীলকে ঘিরে নাচতে থাকে। তখন ও ধাম করে উঠে সবগুলোকে চড়-থাপ্পড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে ওর পা মাটির সাথে আটকে গেছে, ও নড়তে পারছে না, আর শরীর নীল সুতো দিয়ে প্যাঁচানো। ও শুনতে পায় বুড়িমার অদৃশ্য কণ্ঠ।

কাজটা ভালো করিসনি ছেলে। আজ সারা রাত তোকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এটাই তোর শাস্তি।

ছেলেমেয়েরা ততোক্ষণে মাটি থেকে উঠে জামাকাপড় ঝেড়ে নেয়। নীলকে ভেংচি কেটে বলে, তুমি একটা বানর।

কুমির।

একটা শেয়ালও।

ওকে কথা বলতে না দেখে ওরা পাহাড়ে ওঠার জন্য পুব দিকে হাঁটতে থাকে। যেতে যেতে ওরা একটি ছেলেকে দেখতে পায়। হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে কারা যেন ওকে ফেলে রেখে দিয়েছে। ও লম্বা ঠ্যাঙা একটি ছেলে। ওর গায়ে জামা নেই, শুধু একটা ছেঁড়া প্যান্ট পরে আছে। ওকে দেখে সবাই থমকে দাঁড়ায়।

আহারে, ওর কী কষ্ট!

এই তোমার নাম কী?

ছেলেটি কথা বলে না। ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

বুঝেছি, ও বোধহয় বোবা।

আমরা কি ওর একটা নাম রাখবো?

হ্যাঁ, রাখবো। ওর নাম গাবলু।

ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে। চল আমরা ওকে বুড়িমার কাছে নিয়ে যাই। দেখছিস না ও কেমন নেতিয়ে পড়েছে।

ছেলেমেয়েরা ওকে ঘাড়ে তুলে চাঁদের বুড়ির কাছে নিয়ে আসে।

বুড়িমা, ওকে আমরা রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি। ওর খিদে পেয়েছে। ওকে পান্তা-ইলিশ দাও।

চাঁদের বুড়ি ওকে পান্তা-ইলিশ দিলে ছেলেটা গবগবিয়ে খায়।

দেখো, দেখো গাবলু কত খুশি হয়েছে। ওর গাল ফুলে উঠেছে, ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, ওর দাঁতগুলো কী সুন্দর। ওমা, ও কী সুন্দর একটা নীল জামা পরেছে।

ছেলেমেয়েরা হাততালি দিলে গাবলু হে-হে করে হাসে। ওর হাসিতে মায়াবী আলো ভর করে।

তোয়া জিজ্ঞেস করে, বুড়িমা ওকে রাস্তার সিগন্যাল পোস্টের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলো কে?

ট্রাফিক পুলিশ।

পুলিশগুলো এতো শয়তান কেন? ও কী করেছিলো?

যারা গাড়িতে চড়ে, ও তাদের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলো।

তাই বলে এমন করে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে? পুলিশগুলো কি মানুষ না?

মানুষ না খচ্চর, একজন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে।

শুধু শুধু খচ্চর বলছিস কেন? খচ্চর মানুষের সঙ্গে এতো খারাপ ব্যবহার করে না। খচ্চর খুব নিরীহ।

তাহলে ওরা কী?

ইবলিশ, ইবলিশ! সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে।

বুড়িমা, আমরা কেউ পুলিশের চাকরি নেবো না।

বুড়িমা মাথা নেড়ে বলে, চাকরি নিবি, কিন্তু কোনো কোনো পুলিশের মতো শয়তান হবি না। সবাইতো আর খারাপ না। অনেক ভালো পুলিশ আছে।

হ্যাঁ, আমরা শয়তান হবো না। কিন্তু পুলিশের চাকরি করবো। সন্ত্রাসীদের ধরবো।

বুড়িমা ওদের কথায় হেসে বলে, তোরা পুলিশ হলে গাবলুদের মতো ছেলেদের কষ্ট দিবি না।

আমরা ওদেরকে খাবার দেবো। হোটেল-রেস্তোরাঁয় গিয়ে বলবো, তোমরা আমাদেরকে একটু খাবার দাও। আমরা একটি দুঃখী ছেলেকে খেতে দেবো।

আমরা ওকে জামাকাপড় দেবো। আমরা কোনো বাড়িতে গিয়ে ওর জন্য জামা-প্যান্ট যোগাড় করবো।

ঈদের সময় নতুন জামা কিনে দেবো।

ওই, দেখো গাবলুর ঘুম পাচ্ছে বুড়িমা।

চল, ওকে ঘুমুতে দিই। আহা, একটা সোনার ছেলে। ও কথা বলতে পারে না।

ওর বুদ্ধি নেই।

দেখেছো ও কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেমেয়েরা ওর হাত ধরে নিয়ে যায়।

সবাই মিলে নুড়ির বিছানায় শুইয়ে দেয় গাবলুকে। ও একটা অবোধ শিশুর মতো হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ে। বড় বড় করে শ্বাস ফেলে। ওর মাথা কাত হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা ওর চারপাশে বসে থাকে। বলে, ওর ঘুম ভাঙা পর্যন্ত আমরা বসে থাকবো। ও জাগলে ওকে বলবো, তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও। যারা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, আমরা তাদের হয়ে তোমার কাছে মাফ চাইছি গাবলু।

তখন অন্যরা চেঁচামেচি করে বলে, দেখো দেখো ছোট ছোট শিলাখণ্ড থেকে কেমন সুন্দর ফুলের গন্ধ আসছে। ঠিক বাংলাদেশের ভাঁটফুলের গন্ধ।

চাঁদের বুড়ি সুতোয় গুটলি পাকাতে পাকাতে বলে, যারা ভালো চিন্তা করে চাঁদের শিলাখণ্ড তাদেরকে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। এই গন্ধ অন্যদের দেয় না। তোরা আমার লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে।

আমরা ফুল দেখতে পাই না কেন বুড়িমা?

বুড়িমা হা-হা করে হাসে। ওরা দেখতে পায় বুড়িমার মুখ, দেখে ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। কত যে পাপড়ি তার সীমা-পরিসীমা নেই। ওদের চারপাশে ফুলের পাপড়ির ছোটখাটো পাহাড় গড়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা বুকভরে শ্বাস টানলে ওদের ভেতরে দুঃখ মুছে যায়, ওদের অভাবের কথা মনে থাকে না। ওরা বাবা-মায়ের জন্য প্রবল টান অনুভব করে। অভাবগ্রস্ত দুঃখী বাবা-মাকে আনন্দ দেয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ওরা ফুলের পাপড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়ে। ওদের ইচ্ছা, ওরা গাবলুর সঙ্গে একসময় ঘুম থেকে জেগে উঠবে।

সাত বছর উটের জকি হিসেবে কাজ করার পরে দেশে ফিরে আসে জনি। ও মাকে খুঁজে পায় না। শনির আখড়ায় মায়ের সঙ্গে যে কুঠুরিতে ছিলো সেখানে বিরাট দালান উঠেছে। ও এখন কোথায় যাবে? সেই শয়তানটাকে ধরতে হবে যে ওকে পাচার করেছিলো। কিন্তু অল্পক্ষণেই মাকে না পাওয়ার জন্য দুঃখ ওকে বিমর্ষ করে ফেলে। তাহলে কি ওর আপন কেউ থাকলো না? ছোট বোনটাই বা কোথায় গেলো? রাস্তার ধারের বড় একটি গাছের নিচে বসে ও ভেউ ভেউ করে কাঁদে। ওর কান্না দেখে আশেপাশে লোক জমে যায়। ও কারো সঙ্গে কথা বলে না। দেখতে পায় মায়াবী আলোয় ভরে গেছে চারদিক। ওর সামনে বসে বুড়িমা চরকা কাটছে। ওকে বলছে, তোর খিদে পেয়েছে সোনা?

হ্যাঁ, বুড়িমা, খুব খিদে পেয়েছে।

ঐ যে পাথরের থালা, নিয়ে আয় একটা।

জনি থালা নিয়ে এলে চাঁদের বুড়ি ওকে পান্তা-ইলিশ দেয়।

পান্তা-ইলিশ! ইস কতকাল খাইনি। মরুভূমির দেশে আমাকে পাচার করেছিল বুড়িমা। সাত বছর ধরে আমি উটের পিঠে ঝুলে কাজ করতাম। কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ভাত খা রে ছেলে। তুই এক লোকমাও খাসনি কিন্তু।

জনি গবগবিয়ে কয়েক লোকমা ভাত খেয়ে বলে, উহ, কি স্বাদ, এটা নিশ্চয় মেঘনা নদীর ইলিশ। মাগো, মেঘনা নদীর কথা মনে পড়লে আমার ডিঙি নিয়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে। বুড়িমা তুমি কখনো মেঘনা নদী দেখেছো?

বুড়িমা হাসে। বলে, হ্যাঁ, আমি মেঘনা নদীতে অনেক ইলিশ ধরেছি। বড় বড় ইলিশ। তারপর হাটে নিয়ে বিক্রি করতাম।

আমি ঠিকই বুঝে গেছি যে, তুমি মেঘনার ইলিশই এনেছো। এই ইলিশের গন্ধ আমার পুরো শরীরে লেগে আছে। কিন্তু জানো বুড়িমা বাবা যখন চুরির

দায়ে ধরা পড়ে জেলে যায় তারপর মা আমাদের নিয়ে ঢাকায় আসে। বাসাবাড়িতে কাজ করে। তখন আমরা প্রায় না খেয়ে থাকতাম, নইলে আধপেটা থাকতাম। আমি আমার ছোট বোনটাকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা শুরু করি। একদিন একটা লোক আমাকে পাচার করে দেয়। বোনটা কোথায় আমি জানি না।

ও ভালোই আছে।

তুমি কি জানো ও কোথায় আছে?

জানি।

ওর নাম রুনু। বলো না বুড়িমা ও কোথায় আছে। আমার ভীষণ ইচ্ছা করে ওকে দেখতে।

ভাত খেয়ে নে। ওর সঙ্গে তোর দেখা হবে। তুই তো ওকে চিনতেই পারবি না।

আমি যখন ওকে ছেড়ে যাই তখন ওর বয়স ছিলো দেড় বছর। এখন ওর বয়স আট, আর আমার চোদ্দ।

জনির চারদিকে আবার মায়াবী আলোয় ভরে যায়। ও পাথরের ভেতর থেকে ফুলের গন্ধ পায়– সামনে একটা পাহাড়, বিশাল দুটি গর্ত, কিন্তু ঝকঝকে আলো চারদিক অপরূপ করে রেখেছে। ও বুড়িমাকে দেখতে পায় না। তবুও জিজ্ঞেস করে, বুড়িমা তুমি কি রুনুকে চেনো?

চিনিরে ছেলে, চিনবো না কেন? তোর মাকেও চিনতাম।

আমার মা কোথায়? আমি মাকে দেখতে চাই। মা বোধহয় আমার জন্য কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় গেছে। বল না বুড়িমা আমার মা কোথায়? মেঘনা নদীর পাড়ের সেই গ্রামে– সেটা আমার নানার বাড়ি, যে গ্রামে আমি জন্মেছিলাম, তারপর ঢাকা শহরে আমি বিক্রি হয়ে যাই। আমার খুব কষ্ট বুড়িমা।

নিজের মনে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে জনি চুপ করে যায়। চারদিকে তাকায়। এখনও বুড়িমাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বুড়িমার কথা শুনতে পাচ্ছে। ও উঠে হাঁটতে শুরু করে। ও আবার জিজ্ঞেস করে, বুড়িমা, তুমি আমার মায়ের কথা বলছো না যে? বলো না মা কোথায়? আমাকে দেখলে মা ভীষণ খুশি হবে। আমার কাছে কিছু টাকা আছে সেটা আমি মাকে দিয়ে দিতে চাই। তুমি কি জানো আরব আমিরাতে উটের জকি হিসেবে শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করা হলে আমি মুক্তি পাই।

তারপর অডিট পাসপোর্টের মাধ্যমে তোকে দেশে পাঠানো হয়েছে রে ছেলে, আমি জানি।

আমার মায়ের কথা বলছো না কেন?

তোর মা বেঁচে নেই।

নেই? হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে জনি।

কাঁদিসনা সোনা। মানুষের জীবনে বাবা-মা কি চিরকাল থাকে।

একবার যদি মাকে দেখতে পেতাম।

আহারে সোনা দুঃখ বুকের মধ্যে রাখ। দুঃখ থাকলে অন্যায় করা কঠিন হয়। দুঃখ মানুষের বন্ধু।

সত্যি বলছো?

সত্যি। তুই যদি ঠিকমতো দুঃখ বুঝতে পারিস তবে দেখবি খারাপ কাজ করতে হাত উঠবে না।

আমি রুনুকে কখন দেখতে পাবো?

সামনে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবি পুব-পাহাড়ের ধারে বসে ছেলেমেয়েরা একটা গুহা বানাচ্ছে, ওখানে তোর বোন আছে, যা খুঁজে নে গিয়ে। ওর চুলগুলো কোঁকড়া, মাথাভর্তি চুল, প্যাকাটির মতো শরীর, রাস্তাঘাটে বড় হয়েছে তো, শ্যামলা গায়ের রঙ, সবুজ জামা পরে আছে।

তাহলে আমি যাই। ওকে বুকে নিলে আমি মায়ের দুঃখ ভুলতে পারবো।

ফকফকে সাদা আলোয় দৌড়াতে থাকে জনি। আর চিৎকার করে ডাকে, রুনু, রুনু–। কিন্তু পরক্ষণে বুঝতে পারে কোথাও কোনো লোক নেই। ওর চিৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে না। ও খেয়াল করেছে শুধু বুড়িমার কথাই ওরা শুনতে পায়। আর বুড়িমাও ওদের কথা শুনতে পায়। এটা তাহলে কোন জায়গা? শনির আখড়া নাকি মেঘনা পাড়ের পুজারণ গ্রাম! জনি দৌড়ে পথ শেষ করতে পারে না। দৌড়াতে দৌড়াতে ও যখন পাহাড়ের কাছাকাছি হয় তখন ওরা চেঁচিয়ে বলে, দেখ দেখ একটি ছেলে আসছে। ও বোধহয় আমাদের মতো বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

জনি কাছে এসে দাঁড়ালে ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কোথা থেকে এসেছো?

শনির আখড়া থেকে।

কেন এসেছো?

আমার বোনকে খুঁজতে।

কে তোমার বোন?

রুনু, রুনু কৈ?

রুনু! সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে। ছোট্ট রুনু এগিয়ে এসে বলে, আমি রুনু। মা বলেছিলো আমার একটা ভাই ছিলো জনি নামে। শয়তান লোকেরা ওকে চুরি করে পাচার করে দিয়েছিলো। তুমি কি আমার সেই জনি ভাই?

হ্যাঁ, আমি সেই জনিরে রুনু। আয়।

রুনু জনির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'ভাইবোন গলা জড়াজড়ি করে কান্নাকাটি করে। রুনু কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা মারা যাবার সময় তোমার কথা

বলতে বলতে মারা গেছে ভাইয়া। তোমার দুঃখেই মা বেশিদিন বাঁচেনি।

কি হয়েছিলো?

অসুখ। কি অসুখ আমি জানি না। মা মরে গেলে আমার যে কি হয়েছিলো তা আর তোমাকে বলতে চাই না ভাইয়া।

থাক আমি শুনবো না। তোকে পেয়েছি এতেই আমি খুশি। আমার কাছে যা টাকা আছে তা আমি তোকে দেবো। আজ আমাদের আনন্দের দিন রে রুনু।

সকলে চেঁচামেচি করে, ঠিক ঠিক আজ আমাদের আনন্দের দিন। চলো আমরা বুড়িমার কাছে গিয়ে মিষ্টি খাই।

চলো চলো, ছেলেমেয়েরা দৌড়াতে শুরু করে।

পথে ওরা নীলের সামনে এসে দাঁড়ায়। নীলের মুখ বন্ধ, পা আটকানো।

তোয়া বলে, এখনো তোমার শাস্তি শেষ হয়নি?

পুপা বলে, নীলকে ছেড়ে দাও বুড়িমা।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, আমরা তোমার পায়ে ধরি বুড়িমা, নীলকে ছেড়ে দাও।

তখন নীল নড়ে চড়ে ওঠে। ওর মুখে হাসি ফোটে। চোখে রুপালি আলো ঝিলিক দেয়। ও ছেলেমেয়েদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে।

জনি জিজ্ঞেস করে, তোমার কি হয়েছিলো?

বুড়িমা আমার সঙ্গে রাগ করেছিলো।

তুমি কি করেছিলে?

তেমন কিছু করিনি, যা নিয়ে রাগ করা যায়।

বুড়িমা কোনো অন্যায় কাজ করে না। তুমি সত্য বলার সাহস রাখো না।

নীল খানিকটা রাগত স্বরে বলে, তোমাদের মতো বাঁদর ছেলেমেয়ে আমি দেখিনি।

আস্তে বলো, একথা শুনলে বুড়িমা তোমাকে আবার বেঁধে রাখবে।

নীল কথা বলে না। বিরক্ত বোধ করে। ছেলেমেয়েরা চাঁদের বুড়ির কাছে মিষ্টি চাইলে বুড়ি পান্তা-ইলিশ দেয়।

নীল বলে, আমি এখন এটা খাবো না।

চাঁদের বুড়ি হাসতে হাসতে বলে, খেয়েই দেখো না।

নীল এক লোকমা পান্তা আর ইলিশ মাছের টুকরো ভেঙে মুখে দিয়ে চমকে ওঠে। অপূর্ব মিষ্টির স্বাদ। নিজের দেশে এমন স্বাদ ও কখনো পায়নি।

বুড়িমা এটা কোথা থেকে এলো?

এতো বাংলাদেশের মিষ্টি।

তোমাকে আমি মিষ্টির দোকান দেখিয়ে দেবো নীল। তুমি আজ আমাদের সঙ্গে থাকবে।

নীল জনির দিকে তাকায়।

শুনলাম তুমি আরব আমিরাতে ছিলে?

হ্যাঁ, ওরা আমাকে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করেছে। ওরা আমার মতো শিশুদের উটের গলায় বেঁধে দিতো। ভয়ে আমরা যখন চিৎকার করে কাঁদতাম ওখন সে চিৎকার শুনে উট তীব্র বেগে দৌড়াতো। এটা উটের রেস খেলা ছিল। এ খেলায় যে উট প্রথম হতো তার মালিক অনেক টাকা পুরস্কার পেতো।

ওহ্ গড। মানুষ কত নিষ্ঠুর।

হা-হা করে হেসে ওঠে তোয়া আর পুপা। বলে, তোমার দেশের প্রেসিডেন্টের নাম কি নীল?

কেন বুশ। তোমরা শোননি?

আমরা পড়েছি বুশ মানে ঝোপ। তোমার প্রেসিডেন্ট কি একটা ঝোপ?

সেই ঝোপে কি শেয়াল থাকে?

নাকি বনবিড়াল থাকে?

নাকি–

হয়েছে থামো তোমরা।

ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে বলে, তুমি আবার রেগে যাচ্ছো। স্বীকার করো যে, তোমরাও খুব নিষ্ঠুর। ওপর থেকে ক্লাস্টার বোমা ফেলে মেরেছো ইরাকের শিশুদের।

তোমরা বেশি বাজে কথা বলছো।

একটুও বাজে কথা না নীল। তুমি কি ইরাকের কিশোরী আমলের ডায়েরি পড়েছো?

না পড়িনি। আমি পড়তেও চাই না।

তুমি আবার রেগে যাচ্ছো। তুমি তো জানো না যে গতকাল চাঁদের বুড়ি ডটকমে আমল ই-মেইল পাঠিয়েছে। ও আসছে আমাদের সঙ্গে দুদিন কাটাতে। আমরা সবাই মিলে ভেবে দেখবো যে ইরাকের শিশুদের জন্য কি করা যায়। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে নীল?

আমি থাকতে পারবো না। আমার প্রেসিডেন্টের নির্দেশ ছাড়া আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। তোমরা তো জানো আমরাই পৃথিবীর ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র। তুচ্ছ বিষয়কে আমরা গুরুত্ব দেই না।

মানুষের জীবন তোমাদের কাছে তুচ্ছ?

ক্ষমতার কাছে কখনো কখনো জীবন তো তুচ্ছই হয়। ভুলে যাও কেন? তোমরা একটা ছোট্ট গরিব দেশ, তোমরা তো ক্ষমতার স্বাদ পাওনি কখনো পাবেও না।

জনি লাফ দিয়ে সামনে এসে বলে, আমরা সবাই মিলে তোমাকে ধরে চাঁদের দেশ থেকে ফেলে দেবো।

দেখোই না ফেলে। পারো কি না দেখি।

চাঁদের বুড়ি সব পারে, সেটা তো তুমি টের পেয়েছো।

নীল চুপ করে থাকে, কিন্তু হাতে ধরা থালাটা দূরে ছুঁড়ে মারে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ওটা আবার ফিরে আসে ওর হাতে। ও আশ্চর্য হয়ে দেখে খালি থালাটা আবার পান্তা-ইলিশে ভরে গেছে। ছেলেমেয়েরা হা-হা করে হাসতে থাকে। ও আবার থালাটা ছুঁড়ে ফেলতে গেলে দেখতে পায় থালাটা ওর হাতে আটকে গেছে।

পুপা খুব শান্ত কণ্ঠে বলে, তুমি শুধু ক্ষমতার কথা বলো কেন? ভালোবাসার কথা বলতে পারো না? চাঁদের দেশটা দখল করার পাঁয়তারা করছো তোমরা। কিন্তু চাঁদের বুড়ি বলেছে এখানকার জমি পেতে হলে ডলারে কাজ হবে না। এখানকার একখণ্ড জমি, কিংবা একটি পাহাড় কিংবা একটি গর্তের দাম হলো ভালোবাসা। এই জমি তোমার একার হবে না। হবে মানুষের, যে মানুষেরা তোমার মতো একই রকম জীবনযাপন করবে।

রাগে নীল দাঁড়িয়ে বলে, এটা কি মগের মুল্লুক! যার যার জীবন সে ঠিক রাখবে। কেউ কারো দায়িত্ব নিতে পারবে না।

তাহলে তোমরাও ক্ষমতার লোভে অন্যের দেশে ঢুকতে যেও না।

তোমরা তোমাদের পণ্য অন্যের দেশে পাঠাবে না।

অস্ত্র বিক্রি করবে না।

তোমাদের জন্যই পৃথিবীতে শান্তি নেই।

নীল রাগ করে উঠতে যাওয়ার চেষ্টা করলে টের পায় যে ও উঠতে পারছে না। হাত থেকে থালাও নাড়াতে পারছে না। এবং এভাবে আটকে যাওয়ার কারণে নিজেকে একটি গাধার মতো লাগছে। ও চেঁচিয়ে বলে, বুড়িমা তুমি বারবার এভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছো কেন?

কারণ তুমি শিষ্টাচার জানো না। তোমাকে শিষ্টাচার শিখতে হবে।

আমার বাবা-মা আমাকে এভাবেই শিখিয়েছে।

বাবা-মায়ের ওপর দোষ চাপাচ্ছো কেন? তুমি নিজে কিছু জানোনা? লেখাপড়া শেখোনি?

চুপ করে থাকে নীল তখন ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে বলে, আমল এসেছে, আমল এসেছে।

তোমাকে চাঁদের দেশে স্বাগতম আমল।

তোমাদের কাছে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। তবে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। আমাকে আমার মা আর ভাইবোনের কাছে ফিরতে হবে। আমাকে বুশের কাছে যেতে দেয়া হবে না, তাই আমি নীল আর্মস্ট্রংকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো।

বলো, কি প্রশ্ন করবে? বুড়িমা আমাকে নড়াচড়ার সুযোগ করে দাও।

তুমি যেভাবে আছো এভাবে বসেই কথা বলো।

তুমি আমার কথা শুনছো না কেন বুড়িমা?

আমি যেভাবে বলছি তুমি সেভাবেই আমার কথা পালন করো। কারণ তুমি এই ইরাকি শিশুটির ওপর হিংস্র হয়ে উঠতে পারো।

আমল তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। আমরা এখানে বসে কথা বলবো। আমল সবার সঙ্গে মাটির ওপর বসে পড়ে। নীলকে প্রশ্ন করতে শুরু করে ও।

তুমি কি জানো, তোমরা যখন আমাদের দেশ আক্রমণ করেছিলে, তখন আমি একটি ডায়েরি লিখেছিলাম?

আমি জানি না। এত ছোট খবর আমি রাখি না।

তোমার প্রেসিডেন্ট বুশ যে আমার দেশ আক্রমণ করেছে সে খবরও কি তোমার কাছে খুব ছোট?

নীল চুপ করে থাকে।

বুশ কি ভীষণ অন্যায় কাজ করেনি?

নীল উত্তর দেয় না।

তোমরা কি মনে করো পুরো পৃথিবীটাই তোমাদের দখলে?

এসব প্রশ্ন আমাকে করছো কেন?

ছেলেমেয়েরা সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, কারণ তুমি তোমার বড় দেশের ক্ষমতার গর্ব করো।

করবোই তো। করাই উচিত।

আমল বলে, যুদ্ধের কারণে আমরা কেন মারা যাবো? আমাদের মতো ছোটদের তো কোনো অপরাধ নেই। ওহ্ কি নির্মমতা! একদিন ভোর চারটায় বুশ বোমাবর্ষণ শুরু করে। তেইশে মার্চ ফনর হোটেলে শান্তিকর্মীরা জড়ো হয়েছিলো। সবাই যখন শান্তির কথা বলছিলো তখন হঠাৎ বোমার শব্দে সবাই চমকে ওঠে। এভাবে ক্রমাগত আক্রমণের মাত্রা বাড়ে। বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়, পানির লাইন কাটা। তুমুল যুদ্ধ চারদিকে। তারপর দশই এপ্রিল রেডিও শুনে ঘুম ভেঙে যায় আমাদের। শুনতে পাই, আমেরিকা ইরাক দখল করে নিয়েছে। কত জীবন, মৃত্যু, রক্তপাত বইয়ে তোমরা আমাদের ওপর চরম বর্বরতার পরিচয় দিয়েছো। তোমরা কেন শিশুদের মেরে ফেলেছো? উত্তর দাও।

নীল কথা বলতে পারে না। ওর মনে হয় বর্বরতার উত্তর বর্বরতাই দিতে পারে। ও নিজেকে এতখানি বর্বর ভাবতে প্রস্তুত ছিল না। চুপ করে থাকা ছাড়া ওর আর কিইবা করার আছে।

কথা বলছো না কেন নীল?

তোমরা আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করো না।

তাহলে তোমার প্রেসিডেন্ট বুশের যুদ্ধ-অপরাধের জন্য তোমাকে আমলের কাছে মাফ চাইতে হবে।

আমার বাংলাদেশের বন্ধুদের ই-মেইল পেয়ে আমি এখানে এসেছি। আমি চাই ইরাকের সব শিশুর পক্ষে তুমি আমার কাছে মাফ চাইবে।

নীল ধীর কণ্ঠে বলে, ইরাকে বুশের যুদ্ধাপরাধের জন্য আমি ইরাকের সব শিশুর কাছে মাফ চাইছি। তুমি আমার মাফ চাওয়ার বার্তা শিশুদের কাছে পৌঁছে দিও।

হুররে, ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে ওঠে। নীলের হাত থেকে থালাটা উড়ে যায়, ও নড়েচড়ে ওঠে। বুঝতে পারে বুড়িমা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। মায়াবী আলোয় ভরে গেছে চারদিক। নীলের মনে হয় এই শিশুদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর লজ্জা করছে। ও আর এখানে থাকবে না। ওর চলে যাওয়াই ভালো। ও মন খারাপ করে উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে। নিজের ভেতরের প্রবল অপরাধ ওকে মরমে মারে। ছেলেমেয়েরা আজ ওকে যে শিক্ষা দিয়েছে সেটা ওর দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছে। বারবারই মনে হয় ওরা তো ঠিকই বলেছে। বড় দেশ হলে অন্যের দেশ দখল করা তো ডাকাতির শামিলই, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বড় দেশ বলে ক্ষমতার গর্ব করা উচিত নয়– মানুষের জন্য মানুষের ভালোবাসাই শেষ কথা, তাহলেই টিকে থাকবে পৃথিবী– টিকবে অস্ত্র দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে। নীল মনের দুঃখে মাটির ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ে।

এগিয়ে আসে একটি খেঁকশিয়াল। নীল চমকে উঠে বলে, কে...কে রে তুই?

আমি খেঁকশিয়াল।

কী চাস এখানে?

আমি তোমার নাকটা চাই।

আমার নাক? নাক দিয়ে তুই কী করবি?

তোমার নাক দিয়ে আমি ফুটবল বানাবো। লাথি দিয়ে গোলপোস্টে ঢুকাবো। এই আমি এখানে বসলাম।

এগিয়ে আসে বনবিড়াল। সরাসরি বলে, আমি তোমার দাঁতগুলো চাই।

কী করবি দাঁত দিয়ে?

এগুলো দিয়ে খঞ্জনি বানাবো। খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইবো, ভালোবাসার গান। ভালোবাসার গান শুনলে মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা হয়, নইলে মানুষ মরে যেতে চায়।

নীল দুহাতে নিজের চুল আঁকড়ে ধরে। ভয়ে ওর শরীর কাঁপে।

এগিয়ে আসে বানর। বলে, আমি তোর পেটটা চাই। ওটা দিয়ে ঢোল বানাবো। ঢোল বাজিয়ে সব বানরকে জড়ো করবো। সেই মানুষদের ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবো যারা শয়তান।

এগিয়ে আসে টুনটুনি। বলে, তোর নাড়িভুঁড়ি নেবো আমি। ওটা দিয়ে বকুল ফুলের মালা গাঁথবো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছা চাঁদের বুড়ির গলায় একটা মালা দেবো। চাঁদের বুড়িই মানুষকে ভালোবাসে।

এগিয়ে আসে ব্যাঙ। বলে, আমি তোর দু'হাত নেবো। দু'হাত শিকল দিয়ে বেঁধে পাহাড়ের চূড়ায় বেঁধে রাখবো। দেখাবো অন্যায় করলে কীভাবে শাস্তি পেতে হয়।

এগিয়ে আসে অজগর। বলে, আমি তোর পা জোড়া নেবো। এগুলো গর্তে ফেলে দেবো। যেন অন্যের দেশ দখল করার জন্য ওই পা সেই দেশের মাটি ছুঁতে না পারে।

ওহ্, তোমরা থামো থামো।

সকলে একসঙ্গে বলে, তোরা যেমন অন্যকে টুকরো টুকরো করিস, আমরাও তোকে টুকরো টুকরো করবো। বুঝবি টুকরো টুকরো হতে কেমন লাগে নীল আর্মস্ট্রং।

হায় ঈশ্বর। নীল দু'হাতে মুখ ঢাকে।

ওকে আক্রমণের শুরুতে শোনা যায় চাঁদের বুড়ির কণ্ঠ।

তোরা থামরে, ওরে তোরা থাম।

মায়াবী আলোয় ভরে যায় চারদিক। প্রাণীকুল থমকে দাঁড়ায়। বুঝতে পারে চাঁদের বুড়ি চায় না যে চাঁদের মাটিতে রক্তপাত হোক। তখনো বুড়িমার গলা শোনা যায়, নীল শিশুদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। তোরাও ওকে ক্ষমা করে দে, ময়নারে।

টুনটুনি বলে, বুড়িমা বাজপাখি আসছে ওর হৃৎপিণ্ডটা নেয়ার জন্য। আমরা বাজপাখির উড়ে আসার শন শন শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ঠিক আছে ওকে আমি দেখছি। তোরা ঘাবড়াস না ময়নারা। নীল তুমি আমার কাছে এসো।

মায়াবী নীল আলোয় ভরে যায় চারদিক। নীল নিজেকে দেখতে পায় চাঁদের বুড়ির পাথরের ঘরে। ওর ভীষণ কান্না পায়। নিজ দেশের শাসকের বর্বরতার জন্য গ্লানির কান্না। অপরাধ যে কত জমেছে সেটা বোঝার কথা ও কখনো ভাবেনি। ভাবনার কথা মনে করে ওর দু'চোখ জলে ভেসে যায়।

তখন ছেলেমেয়েরা দৌড়াতে দৌড়াতে আসে।

নীল আমল চলে যাচ্ছে। ওকে বিদায় জানাচ্ছি আমরা। এসো আমাদের সঙ্গে। তুমি ওকে চাঁদের ভেলায় উঠিয়ে দাও।

নীল দু'হাতে চোখ মুছে হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমলকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমাদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তা আমেরিকার চোদ্দগুষ্ঠী ক্ষমা চাইলেও সেটা ক্ষমা হয় না। তারপরও তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দিও।

আমল মৃদু হেসে বলে, থ্যাঙ্কু নীল।

আবার ভরে যায় মায়াবী নীল আলোতে চারদিক। চাঁদের বুড়ি বলে, চাঁদের ভেলায় ওঠার আগে আমল আমাদের সঙ্গে পান্তা-ইলিশ খাবে।

ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করে থালা নিয়ে আসে। চাঁদের বুড়ি সবার থালায় পান্তা ভরে দেয়, ইলিশের গন্ধ ম-ম করে চারদিকে, কিন্তু থালাভরা পানিসহ পান্তায় হাত ডুবিয়ে ছেলেমেয়েরা তাতে পায় চমৎকার কেক, পেঁয়াজু, ডালপুরি এবং একটি বড় রসগোল্লা।

আমল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, কেক ঠিক আছে, পেঁয়াজু, ডালপুরি আর রসগোল্লা আমি কখনো খাইনি। দারুণ লাগছে। আমার বিদায়টা তোমরা সুন্দর করে ভরিয়ে দিয়েছো। থ্যাঙ্কু, বাংলাদেশ।

নীল সঙ্গে সঙ্গে বলে, না বলো থ্যাঙ্কু চাঁদের দেশ।

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে বলে, না বলো বাংলাদেশ, বাংলাদেশ।

নীল হাসতে হাসতে বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাংলাদেশই। আমরা এখন বাংলাদেশেই আছি।

মায়াবী নীল আলোয় ভরে যায় চারদিক। চাঁদের ভেলাকে উড়িয়ে নিয়ে আসে চাঁদের বুড়ি। কী সুন্দর ভেলা– কলাগাছের ওপরে ছোট একটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের ভেতরে শীতল পাটি বিছানো। এক কোণায় পান্তা-ইলিশ দেয়া হয়েছে। আমলের খিদে পেলে খাবে।

অপরূপ মায়াবী আলোয় আমল ভেলায় উঠে বসে, ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে বিদায় দেয় আমলকে। কুঁড়েঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমল হাত নাড়ে– ওকে শান্তির দূতের মতো লাগছে– পবিত্র, উজ্জ্বল এবং শিল্পী পিকাসোর সাদা কপোত যেন। নীল অভিভূত কণ্ঠে বলে, অপূর্ব।

ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ে।

চাঁদের বুড়ি তার চরকায় পূর্ণিমার আলো দিয়ে তৈরি নীল আলো পাঠাতে থাকে পৃথিবীতে।

পূর্ণিমার আলোতে ভালোলাগায় অভিভূত হয়ে পৃথিবীতে তোয়া, পুপা, তুষা, রুনু, জনি, কেকা, শান্তা, মায়া, মন্টু, সাদেক, অজয় এবং এমন আরো অনেকের বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়েরা বলতে থাকে, দেখো দেখো আজকের পূর্ণিমার আলো একদম অন্যরকম। মনে হয় এ বছরে আমাদের জীবনে অভাব থাকবে না। নিশ্চয় আমাদের ক্ষেতগুলো ফসলে ভরে উঠবে।

সেই পূর্ণিমার রাতে অনেক রাত পর্যন্ত মানুষেরা জেগে থাকে। ওদের মনে হয়, গোল চাঁদটার মধ্যে ওরা চাঁদের বুড়িকে দেখতে পাচ্ছে।

চাঁদের বুড়ির পেছনে অসংখ্য কালো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে ওগুলো ছেলেমেয়েদের ছায়া। কিন্তু পৃথিবীর মানুষেরা বুঝতে পারে না যে এত ছেলেমেয়ে চাঁদের বুড়ির কাছে কীভাবে গেলো। তবু মানুষেরা খুশি হয় এই ভেবে যে ওরা যদি ওখানে পৌঁছে থাকে তবে ভালো আছে– দুঃখ থেকে, কষ্ট থেকে দূরে আছে। নিশ্চয় চাঁদের বুড়ি ওদের ভীষণ যত্ন করে রেখেছে।

ওদিকে চাঁদের দেশে বসে ছেলেমেয়েরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিজেদের বাবা-মাকে খুঁজতে থাকে। একজন বলে, ওই যে ওটা আমার মা। নীল শাড়ি পরে আছে। আঁচলটা মাথায় দেয়া। মাকে খুব দুঃখী দেখাচ্ছে।

ওইটা আমার বাবা। হাঁ করে তাকিয়ে আমাকে খুঁজছে। বাবার চশমাটা ভেঙে গেছে। সেজন্য বাবা আমাকে চিনতে পারছে না।

ওইটা আমার আপু। কি সুন্দর একটা লাল ডুরে শাড়ি পরে আছে।

ওইটা আমার মা। পিঠের ওপর চুল ছড়িয়ে আছে।

আমার বড় ভাইকে দেখতে পাচ্ছি। মাঠ থেকে ধান লাগিয়ে এসেছে বোধহয়। সেজন্য হাতে পায়ে কাদা লেগে আছে।

ইস সবাইকে দেখতে কি সুন্দর লাগছে। চাঁদের নীল আলোয় ওরা ডুবে আছে।

এসো আমরা এখানে বসে পৃথিবী দেখি। দেখি ওরা কি করছে।

ছেলেমেয়েরা গোল হয়ে বসে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে। পৃথিবীতে তখন ছেলেমেয়েরা নিজের মতো করে লড়াই করছে বেঁচে থাকার জন্য।

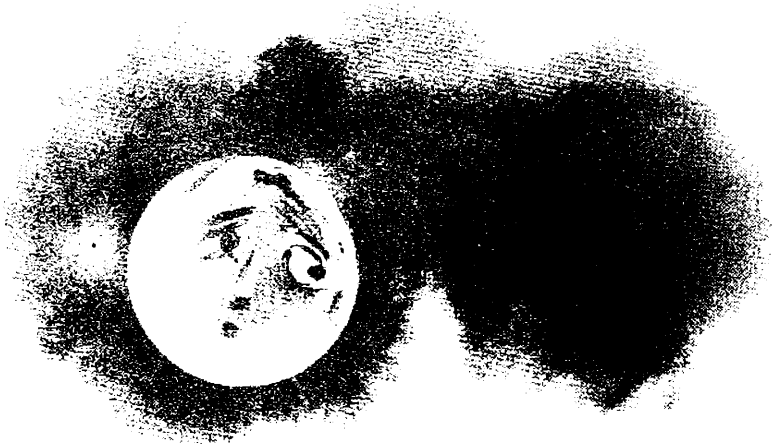

বস্তির ঘরগুলোতে যখন কেরোসিনের অভাবে কুপি জ্বলে না, তখন পলিথিন দিয়ে ঘেরা আকলিমার এক চিলতে ঘর আলোতে ভরে থাকে।

বড়রা এই আলো দেখতে পায় না। কিন্তু ছোটরা যাদের বয়স ষোল বছরের মধ্যে তারা এই আলো দেখতে পায়। ছোট্ট শিউলি বলে, নানির ঘরে আলো টুপটুপ করে।

শিউলির কথা শুনে অন্যরা ভীষণ মজা পায়। হেসে গড়িয়ে পড়ে। তাদের জীবনে এভাবে ওরা আনন্দ বানায়– কখনো হেসে, কখনো বা কেঁদে। ওরা ভীষণ মজা করে আকলিমার ঘরটাকে ডাইনির ঘর বলে। ওদের কাছে ডাইনি হতে আকলিমার একটুও আপত্তি নেই। মজাই পায়। ভাবে, ওরাইতো ওর জগৎ। ওদের নিয়ে একদিন চাঁদের দেশে বেড়াতে যাবে। ওরা যখন ওকে সামনে রেখে ওর কোমর ধরে রেলগাড়ি বানায় তখন আকলিমার মনে হয় এভাবে বুঝি দুনিয়াটা ঘোরা যায়! ওরা সবাই মিলে একটা আজব রেলগাড়ি। ছেলেমেয়েরা তখন সুর তুলে বলে, ডাইনি বুড়ি রেলগাড়ি/ চাঁদের দেশে দেবো পাড়ি। চাঁদ-মামার খই-মুড়ি/ খেয়েদেয়ে দিন গুজারি। তুমুল হাসিতে বস্তি মাতিয়ে ওরা পলিথিনের ঘরে গুটিসুটি হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে, নানি তোমার ঘরে কোথা থেকে আলো আসে?

আকলিমা ফোকলা গালের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলে, মাটির নিচে থেকে।

ছেলেমেয়েরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, মাটির নিচে আবার আলো থাকে নাকি?

সেকি আর আমি জানি রে। আমিতো আলো উঠতে দেখি। মাটিতে হাজার হাজার ফুটো হয়। আর সেই ফুটো দিয়ে আলোর শিখা উঠে আসে।

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, মিছে কথা।

সত্যি কথা রে পাগলা হাতির দল। তোরা দেখতে পাস না?

ওরা আবার চেঁচিয়ে বলে, মিছে কথা।

সত্যি কথা রে বানরের দল। তোরা দেখতে পাস না?

তুমি একটা ডাইনি, ডাইনি। মিছে কথা বলে আমাদের ভোলাচ্ছ।

আকলিমা চমৎকার হাসির মাধুর্যে নিজেকে ভরিয়ে তোলে। ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মোমেনা বলে, মনে হয় তোমার মতো ভালো মানুষ এই বস্তিতে আর কেউ না।

বাবুল বলে, তুমি আমাদের কাছে ডাইনি বুড়ি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমাদের ভয় লাগে না। আমাদের জন্য তোমার চোখে ভীষণ মায়া।

তারপরও তোদের কাছে আমি ডাইনি। আমি ডাইনি হতেই মজা পাই।

খিলখিল হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তুলে শিল্পী বলে, তুমি আমাদের সবুজ আলোর ডাইনি।

এভাবে আকলিমা ছেলেমেয়ের কাছে ডাইনি হয়ে ওঠে। ওরা ওর কাছেই সবচেয়ে বেশি মায়া পায়। আদর-ভালোবাসার জায়গা খুঁজে পায়। ওরা দেখতে পায় কেমন করে যেন মানুষটা বদলে যায়– দু'চোখে সবুজ মায়ার আলো ছড়িয়ে রাখে। বাবা-মায়ের কাছে গল্পে শোনা ডাইনি বুড়ির মতো হিংস্র না, মানুষ-খেকো না, শাঁকচুন্নি বলে যাদের পরিচয় তেমনও না। গভীর রাতে বা ভর-দুপুরে চুল উড়িয়ে দাঁত-কেলিয়ে ভয় দেখানোর মতো কেউ না। ও একজন সুখী ডাইনি।

আকলিমা চাঁদনি রাতে ফুটপাথের ওপর বসে ওদেরকে গল্প বলার সময় বলে, আমি তোদের ভেতরে গল্পের যে ডাইনি আছে সে ছায়াটা বের করে দেব। যারা ওই ডাইনিগুলো বানিয়েছিল তাদের বুঝিয়ে দেব যে ডাইনি হওয়া সহজ কথা না।

ঠিক বলেছ। ডাইনিরা তোমার মতো সবুজ আলো নিয়ে ছোটদের জন্য ঘুরে বেড়ায়। যারা রাস্তায় থাকে তাদের সবুজ আলোর মায়া দেয়। ঠিক বলেছি?

বলেছিস, বলেছিস। তোদের কাছে আমি সত্যিকারের ডাইনি হবো। দেখবি গল্পের ডাইনিরা তোদের ভেতর থেকে পালিয়ে যাবে।

হি-হি হাসির ঝড় ওঠে। হাসতে হাসতে ওরা রাস্তার ধারে ঘুমিয়ে পড়ে– কাগজ বিছিয়ে নয়তো পলিথিন। নয়তো বাসস্ট্যান্ডের বেঞ্চে কিংবা লঞ্চঘাটের প্ল্যাটফরমে। ওদের কি ঘুমুনোর জায়গার অভাব? পুরো শহরের খালি জায়গাগুলোতে কাত হলেই ওদের দুচোখে ঘুম নামে। ওদের ঘুমিয়ে পড়ার জন্য কোনো মা গান করে না। কখনো কোনো মা ওদের কারো দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে মারতে গেলে ওরা আকলিমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বুড়ি ওদের এমন করে

আড়াল করে যে মায়েরা আর খুঁজে পায় না। তখন বুড়ির ছেঁড়া রঙের শাড়িটা ঘন ঝোপের মতো হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের কেউ সে ঝোপের মধ্যে বসে মায়ের খোঁজাখুঁজি দেখে ফিকফিক করে হাসে।

ফুলমণির মা হাসিনা এসে চিৎকার করতে থাকে।

আমার মেয়েটা কই খালা?

আকলিমা যেন তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এমনভাবে চারদিকে তাকায়। দু'হাতে চোখ কচলে বলে, চোখে যে কি হয়েছে রে মেয়ে? এখন আর ঠিকমতো দেখতে পাই না।

হাসিনা খনখনে কণ্ঠে বলে, ঠিকই দেখতে পান খালা। আপনি পোলাপানগুলোকে লাই দিয়ে মাথায় তোলেন বলেইতো ওরা নষ্ট হয়। আমাদের কথা শুনতে চায় না।

হি-হি করে হেসে আকলিমা আঙুল নাড়িয়ে বলে, রাস্তার পোলাপানের আবার নষ্ট কি রে হাসিনা? ওদেরকে কি ভালো কিছু দিয়েছিস যে ভালো থাকবে?

আমার কিছু থাকলেতো দেবো। জোটাতে পারলেতো ঠিকই দিতাম। পারিনাতো।

না পারলে চুপ করে থাকবি। ওরা ওদের মতো থাকবে। কথায় বলে না, ভাত দেয়ার মুরোদ নেই কিল মারার গোঁসাই। যা, সর আমার সামনে থেকে।

বকা খেয়েও হাসিনা অবাক হয় না। জানে, বুড়ির কাছে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। ও কি জানত না যে বুড়ি এমন উত্তরই দেবে? বুড়ি সারাক্ষণই বলে, তোরা কিল মারার গোঁসাই হবি না।

হাসিনা ফিরে যাবার জন্য ঘুরতেই খেয়াল করে আকলিমা থুত্থুরে বুড়ির মতো বসে আছে। হঠাৎ করে যেন বয়স বেড়ে গেছে। সাদা চুল বাতাসে উড়ছে। আর কুঁচকে যাওয়া গায়ের চামড়া বেয়ে আলো বেরিয়ে আসছে। মনে হয় আকলিমা খালা এখন চাঁদের বুড়ি। হাজার হাজার বছর ধরে চরকায় সুতো কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে একটুখানি জিরিয়ে নিচ্ছে। হাসিনার নিজের মেয়ের জন্য ভীষণ মায়া হয়। ভাবে, মেয়েটার জন্য তো আসলে ও কিছুই করতে পারে না। বরং ফুলমণি কাগজ কুড়িয়ে দশ-বিশ টাকা আয় করলেও তা কেড়ে নেয়। ভেতরে ভেতরে মরমে মরে যায় হাসিনা। বুড়ির সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে চাইলে বুঝতে পারে ওর পা আটকে গেছে। আর আকলিমার মুখটা বুড়ো বয়সের ফুলমণির মুখ হয়ে গেছে। ফুলমণিও একদিন আকলিমার মতো বুড়ি হবে– এই রাস্তায়– বস্তিতে বাস করতে করতে।

হাসিনার খুব কান্না পায়। ও দুহাতে মুখ ঢাকে। ও জানে কাঁদলে ওর দুঃখ লাঘব হয়। কাঁদতে ওর ভালো লাগে। বরং হাসতে ওর ভয় করে। মনে হয় কেউ যদি ওর হাসি দেখে তাহলে সেদিন আর ওর উপার্জন হবে না। এটা ওর ধারণা। জন্মের পর থেকেইতো হাসির আনন্দ তেমন করে পায়নি। বেশি হাসলে মায়ের হাতে মার খেয়েছে, আর অন্যরা বলেছে বেহায়া মেয়ে। তাইতো নিজের হাসি নিজের ভেতর গুঁজে রেখেছে ও। আঁচল দিয়ে চোখ মোছার সময় শুনতে পায় আকলিমা নরম গলায় বলছে, কাজে যা রে মেয়ে। দেরি হলেতো ছুটা কাজের বুয়ারা বেগম সাহেবের কাছে বকা খায়। দেরি করিস না।

হাসিনা শাড়ির আঁচল মাথায় দিতে দিতে বলে, আমার মেয়েটার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, ফুলমণি তোর মা বলেছে তোর জন্য দুটো লেবেনচুষ নিয়ে আসবে। আহারে আমার চাঁদ-সোনা মেয়ে। বলবেন তো খালা?

বলবো, বলবো। আমার নাতনিকে আমি বলবো নাতো কে বলবে? আকলিমার মৃদু হাসির সঙ্গে ফুলমণির হাসিও শুনতে পায় বলে মনে হয় ওর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়। ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলমণি আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার ডাইনি সোনা, ডাইনি সোনা– ডাইনি সোনা চাঁদের কণা।

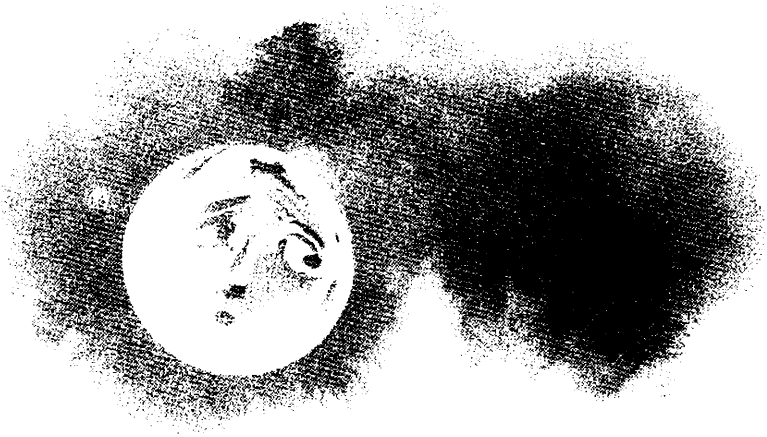

শীতের বেলা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে চারদিকে তাকালে মোমেনা দেখতে পায় রাস্তার মানুষ আর গাড়ির স্রোত। শুনতে পায় মানুষের কণ্ঠস্বর আর গাড়ির শব্দ। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলের নেতিয়ে আসা আলো ওকে বাড়ি ফেরার কোনো আনন্দ দেয় না। কেবলই মনে হয় এটা একটা ঘষটাঘষটির জীবন। মাত্র তেরো বছর বয়সের মোমেনার মনে হয় ও বুঝি আকলিমা বুড়ির মতো বড় হয়ে গেছে। ওর কিছু ভালো লাগে না। মনে হয় এক একটা দিন যায় আর ও ঘষে ঘষে ময়লা তোলার মতো গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে। গার্মেন্টেস-এর মেয়েরা দলেবলে বাড়ি ফেরে। ওর কোনো দল নেই। ওকে একা একা ফিরতে হয়। মা যেদিন ইটভাঙার কাজে আসে সেদিন মা সঙ্গে থাকে, নইলে কাগজ কুড়োতে কুড়োতে ছোট ভাই হীরন এদিকে এলে ওর হাত ধরে বাড়ি ফিরতে ওর ভালো লাগে। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই হীরনের এদিকে আসা হয় না। মোমেনা ফুটপাথ ধরে দ্রুত হাঁটে। স্পঞ্জের স্যান্ডেলে ফটফট শব্দ হয়। কারো গায়ে ধাক্কা লাগলে কেউ বলে, এমন রেলগাড়ির মতো ছুটছিস কেন? তোর জন্য কেউ বসে আছে স্টেশনে? তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, ছেমড়ি! ওর মন আরো খারাপ হয়ে যায়। ভাবে, ওর স্টেশন তো ভেড়িবাঁধের ওপর পলিথিনের ছাউনি। ওই খুপরিগুলো কি ঘর?

শীত পড়েছে খুব। ওর ওড়নাটা টানটান করে জড়িয়ে নেয়। মনে হয় ভীষণ কুয়াশা চারদিকে। নাকি এসব কিছু ধুলোর কুণ্ডলি? সারাদিন ইটভাঙার কাজ করে ধুলোয় ভরা শরীর নিয়ে ক্লান্ত মোমেনা ওই খুপরিতে ফিরে শুয়ে পড়ে। আশেপাশে মায়ের দেখা পায় না। বোধহয় কাজ থেকে ফিরেনি। হীরনও ফিরেনি। বাবাতো ওদের ছেড়ে গেছে কবেই। বাবাকে নিয়ে ওর কোনো ভালো স্মৃতি নেই। মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি-গালাগালি-মারপিট ইত্যাদি মনে রেখে কি একজন মানুষকে স্মরণ করা যায়? নাকি তার জন্য ভালোবাসা থাকে? মোমেনা

শীতে কুকড়িমুকড়ি হয়ে ঘুমোয়। হাঁটুজোড়া বুকের কাছে উঠিয়ে দু'হাত হাঁটুর ভেতর সেঁধিয়ে রেখে ঘুমুতে চেষ্টা করে ও। এভাবে ঘুমুলে শীত কম লাগে ওর। ওদের ঘরে লেপ নেই, কম্বল নেই, ভালো একটি কাঁথাও না। ছেঁড়া কাঁথাটা টানাটানি করলে আরও ছিঁড়ে যায়। ওকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখলে হীরন হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, তোকে একটা ডিমের মতো লাগছে। দেখবি একদিন তোকে কেউ খেয়ে ফেলবে।

খেয়ে ফেলবে? চিন্তায় পড়ে মোমেনা। ইটভাঙার কাজের তদারকির সর্দারটাতো মাঝে মাঝে এমন কথাই বলে। বলে, ঠিকমতো কাজ না করলে একদম চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো। মাগো কেমন বিশ্রি করে লোকটা তাকায়। সত্যি বুঝি রাক্ষসের মতো একদিন ওকে খেয়ে ফেলবে। যেদিন এমন ভাবনা ওকে তাড়া করে সেদিন ও ইটের ভাটার দাউদাউ আগুন স্বপ্ন দেখে। আগুনের হাত-পা জিহ্বা দেখতে পায়– একসময় চিৎকার করে ওর ঘুম ভেঙে যায়। ভয়ে কাঁপতে থাকে। ঘামে শরীর ভিজে যায়। মোমেনার মনে হয় ও তলিয়ে যাচ্ছে– গভীর কোনো নদীর তলদেশে।

আজ ও ধুলোয়ভরা শরীরটা নিয়ে ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু ঘুম আসে না। ক্লান্তিতে ওর মাথা ঘুরতে থাকে। ওর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। মাথায় তেল দিয়ে আঁচড়াতে ইচ্ছে করে এবং পরক্ষণে মনে হয় ওর বমি পাচ্ছে। ও উঠে বসে এবং মাথা হাঁটুতে ঠুক্‌তে থাকে। তখন ওর খুপরি সবুজ আলোতে ভরে যায়।

আকলিমা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, এমন করছিস কেন?

আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

আকলিমা মৃদু হেসে বলে, মরবি কেন? তোকে দেশের রানী হতে হবে। হাসিনা-খালেদার মতো।

মোমেনা ঝাড়ি মারে, বলেছে তোকে রানী হতে হবে। আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তোর শখ থাকলে তুই রানী হ। আমি রানী হবো না।

আকলিমা মোলায়েম কণ্ঠে বলে, তুই তাহলে কি হবি?

আমি তোর মতো বুড়ি হবো।

বুড়ি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ বুড়ি হবো। ডাইনি বুড়ি।

আকলিমা অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মনে হয় মেয়েটা আসলেই বুড়ি হবে। না, ওতো এই বয়সেই বুড়ি হয়ে গেছে। নইলে কি ও মরতে চায়?

মোমেনা চেঁচিয়ে বলে, হাঁ করে দেখছো কি?

আকলিমা চুপ করে থাকে। নিজের পুরো জীবনের দিকে পেছন ফিরে তাকায়। মার খেয়ে, লাথি খেয়ে, ভাত খেয়ে না-খেয়ে, আদর-সোহাগ না পেয়ে বড় হতে হতে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত এসেছে। ও ডাইনি ছাড়া আর কি?

মোমেনা তখন গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুই আসলে চাঁদের বুড়ি। পূর্ণিমার রাতের মতো তোর গায়ে রঙ। উড়ে যাওয়া তুলোর মতো তোর চুল। আর বাঁকা চাঁদের মতো তোর চোখ। আমরা সবাইতো জানি যা কিছু সুন্দর শুধু সেটাই তুই দেখতে পাস।

আমি যদি চাঁদের বুড়িই হবো, তবে আমার অমাবস্যা কৈ?

তোর আঁধার ভরতে সবুজ আলো নিয়ে ঘুরে বেড়াস। তুই আমাদের পূর্ণিমা-অমাবস্যা সব। তুই না থাকলে আমরা এই রাস্তার ছেলেমেয়েরা কেমন করে যে বাঁচতাম!

আকলিমা মোমেনার কথা শুনে খুশি হয়ে বলে, ঠিক আছে তাহলে তোকে হাসিনা-খালেদা হতে হবে না। তুই ডাইনি বুড়িই হয়ে যা। আমি তোকে চাঁদের দেশে নিয়ে যাবো। তুই আমার সঙ্গে চরকা কাটবি।

হি-হি করে হাসে মোমেনা। ওর মনে হয় এতক্ষণে ওর ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে। শরীর ঝরঝরে হয়েছে। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে।

হাসছিস কেন? কি হয়েছে?

আকলিমা ওকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

মোমেনা হাসতে হাসতে বলে, একটা মিথ্যে স্বপ্নের কথা বললাম, আর অমনি তুই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলি। আমাদের কি কোনো স্বপ্ন দেখা উচিত রে ডাইনি? আমাদের কি কোনো স্বপ্ন আছে?

নাই? আকলিমা হতাশ হয়ে যায়।

মোমেনাও চেঁচামেচি করে বলে, নাহ, নাই। থাকলেতো বেঁচেই যেতাম। ভালো স্বপ্নের মতো সুন্দর জিনিস এই দুনিয়ায় আর কিছু নাই।

মোমেনা নিজের ভেতরে খুঁজেপেতে টুকরো টাকরা স্বপ্নের কুচি ইটের ভাটায় ফেলে দেয়। ওগুলো দাউদাউ করে পোড়ে। পুড়ে কয়লা হয়।

আকলিমা সবুজ আলোয় দেখতে পায় মোমেনার বিষণ্ন চেহারা– ও যেন কতকাল আগের মরা কাঠ। নদীর জলের ছোঁয়ায় ও আবার প্রাণ পেয়েছে। কিন্তু জলের অভাবে আবার মরে যেতে বসেছে। আকলিমার ভীষণ মায়া হয়। আঁচলের খুঁট খুলে মুড়ি আর পেঁয়াজু খেতে দেয় ওকে। বলে, আমিতো জানি তুই পেঁয়াজু খেতে ভালোবাসিস।

হ্যাঁ, বাসিইতো। এতক্ষণ ধরে তো আমি খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম। কয়টা পেঁয়াজু এনেছিস ডাইনি?

দশটা। হবে না?

খুব হবে। দশটা আমি খেতেই পারবো না। আমি পাঁচটা খাবো। আর হীরনের জন্য পাঁচটা রেখে দেবো।

ও দুটা পেঁয়াজু খাওয়ার পর মুখ কাচুমাচু করে বলে, হীরনতো পেঁয়াজু খেতে পারে না ডাইনি।

আকলিমা মৃদু হেসে বলে, পারবে নাতো। আমার সবুজ আলো না থাকলে তো পেঁয়াজুও থাকবে না। তুই সব খেয়ে ফেললে রাতে তোর আর খিদে পাবে না।

হ্যাঁ, এটাই বুদ্ধি। রাতে আমি আর ভাত খাবো না। আমার ভাত হীরনকে দিয়ে দেবো। ও ভাত খেতে খুব ভালোবাসে। যেদিন আমাদের মুড়ি খেতে হয় সেদিন আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। ডাইনিরে, আমাদের অনেক রকম কষ্ট।

আকলিমা ওর কথার পিঠে কথা বলে না। দশটা পেঁয়াজু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে মোমেনা। ওই একই কুকড়িমুকড়ি ভঙ্গি। কতক্ষণ চলে যায় কেউ জানে না। এক ঘুমে পেরিয়ে যায় বুঝি হাজার হাজার রাত। একসময় আকলিমা মোমেনার পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দেয়। মুরগির পালকের সুড়সুড়ি। মোমেনা চোখ খুলে হাই তোলে। ঘুমের আনন্দে ওর দু'চোখে খুশির ঝিলিক। আড়িমুড়ি ভেঙে বলে, ডাইনি জ্বালাস কেন?

উঠে আয়।

কেন?

তুই আর আমি জলার ধারে যাবো।

কেন?

গিমা শাক তুলে আনবো।

শাক ভাজার তেল আছে তোর?

তেল নেই, তো এত ভাবার কি হলো। পানি আছে।

বুঝেছি, ভাজবি না, সেদ্ধ করবি। ওয়াক থু। তেতো শাক কি শুধু সেদ্ধ করে খাওয়া যাবে?

খুব যাবে, আয়। আগেতো শাক নিয়ে আসি।

না, আমি যাবো না।

রাতে কি রান্না হবে তোদের?

রান্না হবে না। মা বলেছে পোলাও-মাংস আনবে।

হি-হি করে হাসে আকলিমা।

হাসছিস যে? তোর ফোকলা গালের হাসি দেখলে আমার রাগ ওঠে।

হাসবো নাতো কি। তোর মা পোলাও কোথায় পাবে তাতো আমি জানি। পোলাওতো না, বিয়েবাড়ির এঁটোকাঁটা। ময়লার মধ্যে ফেলে যাওয়া। কুকুর-বেড়ালের সঙ্গে মারামারি করে কুড়িয়ে আনা।

সেইসব খেয়েইতো এতটুকু হয়েছি। আমার ঘেন্না নাই।

আমার আছে।

আকলিমা গম্ভীর হয়ে বলে।

এজন্যইতো তুই বুড়ি আর আমি ছেড়ি।

দেখো নাতনির কথা।

যেদিকে খুশি সেদিকে যা। আমাকে আর জ্বালাবি না ডাইনি।

ঠিক আছে আমি গেলাম।

যা দেখি কোথায় যাবি। জানিতো আমাদেরকে ছেড়ে তুই কোথাও যেতে পারবি না।

আকলিমা বেশি দূরে কোথাও যেতে পারে না। রাস্তার ধারে উবু হয়ে বসে থাকে। মোমেনা সঙ্গে থাকলে যে শক্তিটা হয় সেটা আর নেই। ছোট্ট একটা লাঠি কুড়িয়ে ধুলোর মধ্যে আঁকিবুঁকি কাটে।

তখন ছুটতে ছুটতে ওর সামনে এসে বসে শিল্পী, রুবি আর লাকী। একবয়সী তিন বান্ধবী। আকলিমা ওদের দিকে না তাকিয়েই বলে, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে কি ঠিক করেছিস তোরা?

বাবা-মায়ের বকুনি আর সয় না।

ফোকলা গালে হেসে আকলিমা বলে, বুঝেছি। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস তার জ্বালা না রে? বাপ-মাকে বুড়ো কালে খাওয়াতে পারবি না, এই খোঁটা, না রে?

হ্যাঁ, শুনতে শুনতে আমরা অতীষ্ঠ হয়ে গেছি। আর সয় না।

সেইজন্য তিন বান্ধবী যুক্তি করে পালিয়েছিস।

আকলিমা হাসতে থাকে।

শিল্পী খানিকটা রেগে বলে, আমরা কি হাসির কাজ করেছি? হাসছেন কেন ডাইনি?

লাকী আক্রমণের ভঙ্গিতে বলে, আমাদের জায়গায় আপনি হলে কি করতেন?

আকলিমা হাসতেই থাকে। রুবি ভীষণ রেগে বলে, এমন করে হাসলে আপনাকে–

কেটে কুটিকুটি করে ফেলবিতো? ফেল, ফেল।

আকলিমা এদের হাতে সবুজ রঙের ছুরি তুলে দেয়।

তিনজনে লাফিয়ে ওঠে বলে, ওহ্ বাবা। পালাই।

ওরা তিনজন উঠতে গেলে আকলিমা তিনজনের হাত চেপে ধরে বলে, বস।

ছুরিটা কৈ?

খেয়ে ফেলেছি।

ওরা হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ডাইনি বুড়ি, ডাইনি বুড়ি।

শিল্পী আর এক ধাপ এগিয়ে বলে, ডাইনি বুড়ি চাঁদের কুঁড়ি। ফুটবি কবে বল?

আকলিমা হাসতে হাসতে বলে, ফুটেছিতো সেই কবেই। ফোটার কি বাকি আছে?

ডাইনি বুড়ি আপনার ফোটা শেষ হলে আমাদেরকে ফোটাতে হবে যে।

বেশ তো ফুটবি তোরা। তার আগে আইসক্রিম খা।

তিনজনে চেঁচিয়ে ওঠে, আইসক্রিম, আইসক্রিম।

আকলিমা তিনজনকে তিনটা লাঠি-আইসক্রিম দেয়।

আইসক্রিমে জিভ ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। চোখ চকচক করে। ওরা মনোযোগ দিয়ে আইসক্রিম খায়। লাকি কুট করে আইসক্রিমের মাথায় কামড় দিয়ে বলে, একদিন আব্বার কাছে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য টাকা চেয়েছিলাম। দেয়নি। বকা দিয়েছিল।

রুবি বলে, আমি কখনো আইসক্রিম খেতে চাইনি। বাপ-মায়ের খ্যাচাখেচি দেখতে দেখতে আমার কিছুই চাইতে ইচ্ছা করতো না।

শিল্পী বলে, আমার মা গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে যা রোজগার করতো বাবা তা নিয়ে যেতো। মা চিৎকার করে কাঁদতো। আর না কাঁদলে রাগ ঝাড়তো আমাদের উপর। মার খেয়ে আইসক্রিমের চিন্তা ভ্যানিশ হয়ে যেতো।

আইসক্রিমের লাঠিটা চাটতে চাটতে তিনজনে হি-হি করে হাসে। হাসতে হাসতে ওরা আকলিমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আকলিমা ওদের বুকে নিয়ে বলে, আমার সোনামানিক তোরা।

আমরা আর বাড়ি ফিরবো না। বাসাবাড়িতে কাজ করবো। আপনার খোঁজে বাসাবাড়ি আছে ডাইনি?

আছে তো।

তাহলে আমাদেরকে কাজে লাগিয়ে দেন।

কাজ করবি তোরা?

নইলে খাবো কি?

থাকবো কোথায়?

আকলিমার সবুজ আলো নিভে যায়। পথের বাতিগুলো জ্বলে উঠলে তিনজনেরই মনে হয় এতক্ষণ কি যেন ছিল সেটা এখন আর নাই। তিনজনেরই মনে হয় আসলে যে আনন্দ নিয়ে ওরা আইসক্রিম খেয়েছিল সেই আনন্দটুকু এখন আর নেই। ওরা আবার খ্যাচাখেচির বাসাবাড়ির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে।

যেখানে ঢুকতে ওদের একটুও ইচ্ছে করে না। কিন্তু ওদের ঢুকতে হবে। তিনজনেই চেঁচিয়ে ওঠে, ডাইনি বুড়ি।

তোদের মন খারাপ?

হ্যাঁ, ভীষণ মন খারাপ। আমরা যে বাসাতেই কাজ করবো না কেন, আমাদের সবসময় মন খারাপ থাকবে ডাইনি বুড়ি।

আকলিমা কথা বলে না। সেতো জানে এটাই সত্যি। ওদের সঙ্গে মিছে কথা বলা উচিত হবে না। শিল্পী আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে এমন একটা বাসা দেবেন যেখানে আমার বয়সী মেয়ে আছে।

অন্য দু'জন জিজ্ঞেস করে, সেই মেয়ে কি তোর বন্ধু হবে?

না, বন্ধু হবে না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওর ছবির বইগুলো দেখবো। ওর খেলনাগুলো নেড়েচেড়ে দেখবো। আর ও স্কুলে গেলে ওর জামাকাপড়গুলো শুঁকে দেখবো। ও যখন টিভিতে কার্টুন দেখবে আমিও গিয়ে বসে থাকবো।

ও যখন খাবে তখন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি না?

থাকবো। পানির গ্লাস এগিয়ে দেবো।

লোভ করবি না?

না। একটুও না। আমি জানি লোভ করলে আমার কপালে কি জুটবে। বাবারে, আমি ওসবের মধ্যেই ঢুকবো না।

আকলিমা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ঠিক আছে, আমি তোর জন্য এমন একটি বাসা ঠিক করে ফেললাম। কাল সকালে তোকে সেই বাসায় নিয়ে যাবো। লাকী তোর কেমন বাসা লাগবে বল?

যেই বাসায় কাচের বাক্সে মাছ রাখে আমাকে সেই রকম একটা বাসা দিবেন। যদি পাখি থাকে তাহলে আরও খুশি হবো। আর যদি বিদেশী কুকুর থাকে তাও খুশি হবো।

এসব দিয়ে তোর কি হবে?

সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমি রঙিন মাছের সঙ্গে কথা বলবো। ওই মাছ দেখতে আমি খুব ভালোবাসি। আমার মনে হয় আমি ওদের সঙ্গে সমুদ্রের নিচে গিয়েছি।

আমি ঘুমের মধ্যে এমন স্বপ্নই দেখি। খাঁচার পাখি থাকলে আমি পাখিটাকে ছুঁতে পারবো। আকাশের পাখিকে তো ছোঁয়া যায় না। পাখির নরম পালকে হাত বুলালে আমার মনে হবে আমি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি।

আর বিদেশী কুকুর যদি তোকে কামড়ে দেয়?

কামড়াবে না। ভালোবাসা পেলে ও আমাকে কামড়াতেই পারবে না। ওকে আমি খেতে দেবো। গোসল করাবো।

ভয় পাবি না?

একটুও না। ছোটবেলা থেকে ভয়ের কত কিছুইতো দেখেছি। আমার ভয় কেটে গেছে।

আকলিমা আবারও গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ঠিক আছে কাল সকালে তোকে আমি এমন একটি বাসায় নিয়ে যাবো। রুবি তুই এবার বল যে কেমন বাসা চাস?

আমি একটা নিরিবিলি বাসা চাই ডাইনি। শুধু দু'জন বুড়ো-বুড়ি থাকবে। তাদের ছেলেমেয়েরা থাকবে অন্য বাসায়, না হয় বিদেশে। বাসায় গাছ থাকলে আমি খুশি হবো। বেশি খুশি হবো আম গাছ থাকলে। আমের মুকুল দেখতে আমার ভালো লাগে। আর যদি বড় গাছ না থাকে তাহলে টবের গাছ থাকলেও হবে। আমি রোজ গাছে পানি দেবো। ফুল ফোটার সময় দেখবো কেমন করে কুঁড়িটা একটু একটু করে পাপড়ি মেলে। আমি ভালো মানুষের বাসা চাই ডাইনি। আমাকে যে কাজের কথা বলবে তা আমি করে দেবো। শুধু একটাই আশা সেই নানি যেন আমাকে লেখাপড়া শেখায়।

আকলিমা সবুজ আলো ছড়িয়ে বলে, তোরা খুব সুন্দর রে মেয়েরা। তোদের স্বপ্ন পূরণ হবে। তোরা যেমন বাসা চেয়েছিস এমন বাসাই পাবি। আমিতো জানি কোথায় কি রকম বাসা আছে।

হুররে ডাইনি, হুররে।

তিনজন মেয়ে আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে।

আপনি আছেন বলেই আমরা বেঁচে আছি। আপনি এখন আমাদেরকে আপনার কোলে ঘুমোতে দেন। আইসক্রিম খেয়ে আমাদের পেট ভরে গেছে। আমাদের কোনো খিদে নেই।

তাহলে আয় ঘুমিয়ে পড়।

আকলিমা আঁচল বিছিয়ে দেয়। শুয়ে পড়ে তিন বান্ধবী। সবুজ আলো মিশে থাকে ওদের শরীরে। রাস্তায় ঘুমিয়ে থাকলেও ওদেরকে কেউ দেখতে পায় না।

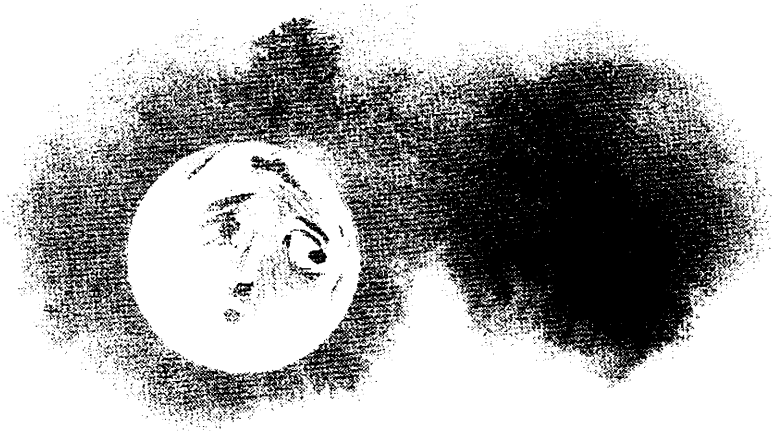

ওসমানী উদ্যানের কাছে বাসস্ট্যান্ডের যাত্রী-ছাউনির নিচে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে ধুমসে সিগারেট টানে আবুল। আজ ওর খুব মন খারাপ। মন খারাপ হলে বিড়ি টেনেই রাত শেষ করে ও। এক প্যাকেট শেষ হতেই যাত্রী-ছাউনি সবুজ আলোতে ভরে যায়।

ও কেশে গলা সাফ করে বলে, কেন এসেছো ডাইনি।

আর বিড়ি খাস না সোনা।

তুমিতো জানো আজ আমার কি হয়েছে। জানো না?

জানিতো। এইদিন তুই বাড়ি থেকে ঢাকায় পালিয়ে এসেছিলি।

কেন এসেছিলাম ডাইনি?

দুঃখে, কষ্টে। বাবা মেরেছিল সেজন্য।

দুঃখে, কষ্টে না। রাগে। বাবা আমাকে পিটিয়ে শেকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। আমি অন্য ছেলেদের সাহায্য নিয়ে শেকল ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।

আহারে সোনা আমার।

তুমি এত আদর করে কথা বলবে না ডাইনি। বাবা-মা আমাকে একটুও আদর করতো না।

তুইতো ওদের কথা শুনতি না সোনা। স্কুলে যেতে চাইতি না। এখানে-ওখানে আড্ডা দিতি। ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতি। ওরা তোর বাবা-মায়ের কাছে নালিশ করতো। স্কুলের টিচাররা নালিশ করতো। সেজন্য তো–

সেজন্য ওরা আমাকে গরুর মতো পেটাতো। এইতো বলবে তুমি?

না, ওদের পেটানো উচিত হয়নি। আমি কখনোই বলবো না যে ওরা ভালো কাজ করেছে। তবে সোনা ছোটবেলা থেকেই তুই অন্যরকম ছিলি। বেপরোয়া, ছন্নছাড়া। তাই না?

তা ছিলাম।

এজন্য ওরা চেয়েছিল তোকে পিটিয়ে শাসন করতে।

কচু করতে।

আবুল ফস্ করে দেয়াশলাই জ্বালায়। কিন্তু দেয়াশলাইয়ের আগুন সবুজ আলোয় ঢেকে যায়। আবুল রেগে বলে, ডাইনি তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে না। আমাকে বিড়ি টানতে দাও। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আমি তোর জন্য ভাত আর মাংস নিয়ে এসেছি।

আমি খাবো না।

কেন খাবি না? তুই না বললি তোর খিদে পেয়েছে।

বলেছিলাম, এখন মনে হচ্ছে খিদে পায়নি।

মিছে বলছিস। নে খা।

আবুল খাওয়ার আগ্রহ দেখায় না। চুপ করে বসে থাকে। ও বলে, জানো ডাইনি পাঁচ বছর আগে এদিন আমি যখন ঢাকায় আসি তখন আমার বয়স দশ। কাউকে চিনি না। বাসের ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাসের হেলপার মেরেছিল। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল। আমার হাঁটু কেটে গিয়েছিল। হাতের তালু ছিলে গিয়েছিল। কিচ্ছু বলতে পারিনি ওকে। কত দিন যে না খেয়ে থেকেছি। কেউ আমাকে খেতে বলেনি। খিদে নিয়ে ছটফট করতাম। ভাবতাম ঘুমিয়ে গেলে খিদে পাবে না। কিন্তু ঘুম আসতো না। ডাইনি, সেইসব দিনের কথা আমি ভুলতে পারি না।

কিন্তু তাই বলে এই বয়সে তুই সন্ত্রাসী হয়ে যাবি?

হয়েছি সাধে? সেসময় তোমার মতো কেউ যদি আমাকে মায়া করতো তাহলে–

তাহলে এ পথে আসতি না।

আবুল চুপ করে থাকে। ওর কাছে এখনো ধন্দ লাগে যে কেমন করে দিনগুলো পার হয়ে গেল। পথেঘাটে ঘুরতে ঘুরতে, মানুষের লাথিগুঁতো খেয়ে একদিন গুলিস্তানে এসে উঠলো। একটি আশ্রয় পেলো। খাটা-খাটনির বিনিময়ে ভাত আর ঘুমুনোর জায়গা জুটলো। ফাইফরমাস খেটে যে-কটা টাকা পাওয়া যেতো তার থেকে বাঁচিয়ে সিনেমা দেখতে পারতো। আস্তে আস্তে জমে উঠলো দিন। টাকা নিয়ে রাজনীতির মিছিলে যাওয়া শুরু করলো। মিছিলে গিয়ে হল্লা করতে বেশ লাগতো। যে দল ডাকতো সে দলেই যোগ দিতো। টাকা নিয়েই কথা। আস্তে আস্তে বড়ভাই হেলালের সঙ্গে পরিচয় হলো। তার কাছেই ক্ষুর চালানো শিখলো। ক্ষুর নিয়ে মারামারি করতে ভালোই লাগে ওর। ওর শরীরে বুনো রাগ তড়পায়। বাবার হাতে মার খাওয়ার প্রতিশোধ ও অন্যের ওপর চালায়। তখন ওর চেহারা হিংস্র হয়ে ওঠে। হেলাল ওর এই নিষ্ঠুরতা দেখে খুব খুশি হয়। বলে, সাবাস তোকে দিয়ে হবে।

কি হবে হেলাল ভাই?

মাস্তানি।

মাস্তানি করে আমি কি পাবো?

টাকা-পয়সা-গাড়ি-বাড়ি সবকিছু।

এসব পেতে আর কতদিন লাগবে?

ধৈর্য ধর। হবে।

হেলাল ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

এসব ভাবনার মাঝে চমকে ওঠে আবুল। তখন আকলিমা মৃদু হেসে বলে, একটা বাড়ি হলে কি করবি?

বাবাকে দেবো। বলবো, এই বাড়িতে হাওয়া খেয়ে সুখে থাকো।

হাওয়া খাবে কেন?

দিনমজুর আবার কি খাবে? পোলাও-কোর্মা?

গাড়ি হলে কি করবি?

মাকে দেবো। বলবো যেখানে খুশি সেখানে যাও। শুধু আমার সামনে আসবে না।

কেন?

মাও আমাকে অনেক মেরেছে।

কেন মেরেছে সেটাওতো ভাবতে হবে তোকে।

কি ভাববো?

যেমন তুই লেখাপড়া করিসনি। স্কুলে পাঠালে তুই বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল খেলে, বল খেলে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতি। এজন্য মায়ের মনে অনেক কষ্ট ছিল। সব মা-ই চায় তার মেয়েটা বা ছেলেটা লেখাপড়া শিখুক, মানুষ হোক।

চুপ করে থাকে আবুল। আকলিমা আরও উজ্জ্বল সবুজ আলো ছড়িয়ে বলে, ঠিক বলেছি?

জানি না।

জানিস। আমি জানি তুই খুব বুদ্ধিমান ছেলে। বল ঠিক বলেছি না ভুল বলেছি?

আবুল বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, ঠিক বলেছো ডাইনি। কিন্তু আমার যে স্কুলে থাকতে ভালোলাগতো না। আমার যে অন্যকিছু করতে ইচ্ছে করতো।

এখনও সময় আছে সোনা। এখনও লেখাপড়া শেখার জায়গা আছে। তুই চাইলেই ব্যবস্থা হবে।

হবে না ডাইনি। আমার আর ফেরার পথ নেই। ফিরতে চাইলে সন্ত্রাসী বড় ভাই মেরে ফেলবে।

আমি আছি কেন?

তুমি থাকলে কি হবে? তুমি আমার লাশটা মায়ের কাছে পৌঁছে দিও।

বাজে কথা বলিস না সোনা।

বাজে কথা না ডাইনি। এমনই হবে। আমি, এখন একটা বিড়ি ফুঁকবো। তোমার সবুজ আলো দিয়ে আগুন ঢেকে দিও না।

আগে ভাতটা খেয়ে নে। তারপরে বিড়ি।

দাও। আমিতো জানি আমাকে না খাইয়ে তুমি এখান থেকে নড়বে না।

খাওয়া হলে ঘুম পাড়িয়ে তবে নড়বো।

আবুল খুব মজা করে ভাত-মাংস খায়। খেতে খেতে গুনগুন করে গান করে। আকলিমা বুঝতে পারে যে ও কি ভীষণ খুশি হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষুদে সন্ত্রাসীটাকে কি ও বাঁচাতে পারবে? ও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। এক গ্রাস ভাত মুখে পোরার আগে আবুল সরাসরি আকলিমার দিকে তাকিয়ে বলে, ডাইনি আমার বাবা-মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। মকবুল, তাহেরুন, শিপনকেও। আমিতো জানি আমার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জে। কিন্তু গ্রামের নাম ভুলে গেছি।

তুই চাইলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। আমি তোকে মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যাবো রে সোনা। যাবি?

আবুল চুপ করে থেকে বলে, হেলাল ভাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হেলাল ভাই যেতে মানা করলে আমার যাওয়া হবে না।

ও চোখের জল লুকানোর জন্য মুখ নিচু করে ভাত খায়। তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য গপগপিয়ে খায়। ওর দিকে তাকিয়ে আকলিমা বলে, আস্তে খা। কাঁদিস না।

আবুল বাম হাত দিয়ে চোখ মোছে। শূন্য থালাটা আকলিমার মুখের কাছে ধরে বলে, শেষ। সবুজ আলোয় অদৃশ্য হয়ে যায় থালা।

আমি কি এখন একটা বিড়ি–

আমাকে জিজ্ঞেস করবি না। তোর যা খুশি তা কর।

তুমি না বলেছো ভাতের পরে বিড়ি। আমিতো ভাত খেয়েছি।

আকলিমা অন্য দিকে মুখ ফেরায়। সবুজ আলোতে ভরে যায় যাত্রী ছাউনি। আবুল বুঝে যে ডাইনি চলে গেছে। ডাইনি চায় না যে ও বিড়ি ধরাক। আবুল অবাক হয়ে দেখে যে এখন ওর মন খারাপ নেই। বিড়ির জন্য জোর তাগাদাও মনে আসছে না। বরং বিড়ি না টেনে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে। ডাইনিকে ভালোবেসে আজ আমি বিড়ি ছোঁব না। ও প্যাকেটটা দূরে ফেলে দেয়।

তারপর শুয়ে পড়ে। বাবা-মাকে স্বপ্ন দেখে। বাবা-মায়ের হাত ধরে মেলায় যাচ্ছে। মেলা থেকে হাতি-ঘোড়া-বাঁশি কিনেছে। বাঁশি বাজাতে বাজাতে মাটির তৈরি হাতি আর ঘোড়া কাঁধে নিয়ে ও জামতলায় এলে দেখা হয় দীপুর সঙ্গে। দীপু ওর প্রাণের বন্ধু। তারপর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলে ওর স্বপ্ন থেকে মুছে যায় গ্রামের পথঘাট, ধানক্ষেত, মাঠ, নদী, পাটপচা গন্ধ, নতুন ধানের গন্ধ, পাটালি গুড়, মোয়া-মুড়কি, সরপুঁটি মাছ এমন আরও কত কি। রাস্তা দিয়ে শব্দ করে চলে যাওয়া বাস কিংবা গাড়ির শব্দ ওর কানে আর ভেসে আসে না। ঘুমের মধ্যে ও কুঁকড়ে থাকে। কারণ ও জানে না আগামী দিনটি ও বেঁচে থাকবে কিনা। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে প্রতিটি দিন এখন ওর এভাবে কাটে। যাত্রী-ছাউনি থেকে আকলিমার সবুজ আলো নিভে গেলে অমাবস্যার অন্ধকার ভরে থাকে ছাউনির ভেতরে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো এখানে এসে ঢোকে না। আবুল পাশ ফিরে শুয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে বেশি নড়াচড়া করার কারণে ও বেঞ্চ থেকে পড়ে যায়। একদিন কপালটা ফুলে উঠেছিল। তারপর থেকে ও সাবধান হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'হাত বেঁধে রাখে বেঞ্চের সঙ্গে। তখন পাশ ফেরার সময় পা আগে নিচে পড়ে। তাতে খানিকটুকু সামাল দিতে পারে নিজেকে।

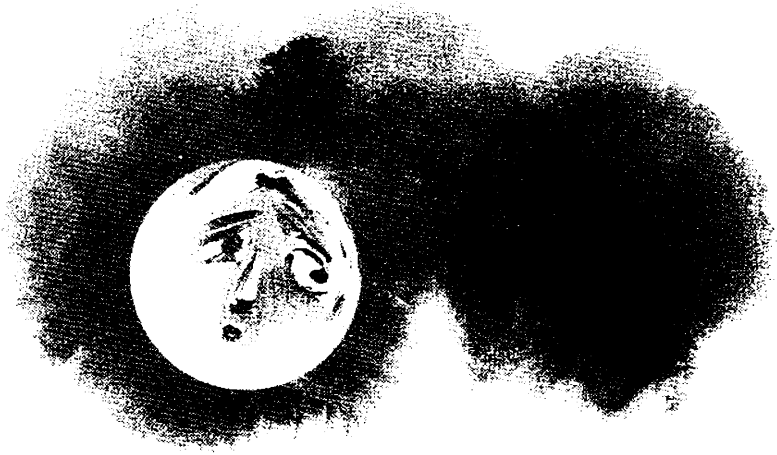

দেখতে দেখতে ভোর হয়।

আবুলের উঠতে ইচ্ছে করে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে। ভোরের নরম আলো চাদরের মতো মুড়ি দিয়ে যদি দিনটা পার করতে পারে তবে ওর মনে হবে গ্রামের বড় তালগাছটির বাবুই পাখির বাসাসহ ছায়ায় ও ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু সেটা হয় না। রোদ বাড়ে। রাস্তায় গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বাসের যাত্রীরা যাত্রী-ছাউনিতে আসতে শুরু করেছে। উঠতে হয় আবুলকে। একজন বিরক্ত হয়ে বলে, এইসব রাস্তার ছেলেগুলোকে নিয়ে যত জ্বালা। এরা ঘুমুবার জায়গা পায় না। যত্তসব।

আবুল রাগতে পারে না। উল্টো মন খারাপ হয়।

হেলালের খোঁজে ও পাড়ার ভেতরে যায়। আজ আর খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে না। রাতের ভাতে এখনও পেটটা টইটুম্বুর বলে মনে হয়। বেশ ঝরঝরে লাগছে। ও খুশিতে চারদিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলে, থ্যাঙ্কু ডাইনি।

কি রে কার সঙ্গে কথা বলছিস?

পাশে দাঁড়ানো একজন জিজ্ঞেস করে।

আবুল বলে, একজন বড় মানুষের সঙ্গে।

কোথায় সে?

আছেন। আপনি দেখতে পাবেন না।

সন্ত্রাসের কাজ করতে করতে কি পাগল হয়ে যাচ্ছিস নাকি?

গেলে গেলাম।

আবুল হাত উল্টে ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়ে হেঁটে যায়। তখন খানিকটা দূর থেকে শুনতে পায় বাচ্চার কান্না। সঙ্গে মানুষের হৈ-চৈ। ও এক দৌড়ে সে জায়গায় পৌঁছে যায়।

কি হয়েছে রে মন্নু? তোর দোকানে কিছু?

একজন মা তার মেয়েটাকে আমার দোকানে রেখে চলে গেছে। আমি দোকান খুলে পরিষ্কার করছিলাম। তখন তিনি এসে বলেন, আমার মেয়েটারে এখানে একটুক্ষণ শোয়ায়ে রাখি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় যাবেন?

তিনি বললেন, একটু আসি। এই যাব আর আসব।

আমি বললাম, আচ্ছা। তারপর দেখলাম অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, তিনি আর আসেন না। মেয়েটা এদিকে কান্নাকাটি শুরু করেছে। আমি মেয়েটাকে কোলে নিতে গিয়ে দেখি গলার সঙ্গে এই চিঠিটা ঝোলানো। পড়ে আমি চিল্লাচিল্লি শুরু করি।

দেখি চিঠি।

মন্নু চিঠিটা আবুলকে দেয়। জড়ো হওয়া লোকজন বলে, চিঠিটা জোরে জোরে পড়েন। আমরাও শুনি।

আবুল চিঠিটা জোরে জোরে পড়ে, 'আমার মেয়ের নাম লাবনী। এর বয়স তিন বছর। আমি ওকে খাওয়াতে পারি না। খুবই অভাবে আছি। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি যদি ওকে লালন-পালন করেন তবে আমি খুবই খুশি হবো। ইতি লাবনীর মা হাজেরা।'

একজন বলে, আমার নিজেরই অভাব। আমি পারবো না। আমি গেলাম।

আমিও এই মেয়েকে পালতে পারবো না।

আমিও না। গেলাম।

আপনারা কেউ না পারলে আমি পারবো।

আবুল চিঠিটা উপরে উঠিয়ে নাড়াতে নাড়াতে চিৎকার করে বলে, কেউ না পারলে আমি পারবো। আমি লাবনীকে নিয়ে যাবো। ও হবে আমার আদরের ছোট্ট বোন।

তুই কি করে পালবি ওকে? তোর তো থাকার জায়গা নেই।

নেই তো কি হয়েছে? এখন হবে। ওই শাজাহান লাবনীকে আমার কাছে দে।

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে কাহিল হয়ে পড়েছে। যে ওকে ধরতে যায় তাকে খামচে দেয়।

তোরা সর। আমি ওকে ধরবো। ও আমাকে খামচাবে না। আদর করা শিখতে হয়। বুঝলি?

সন্ত্রাসীটা বলে কি? ও আদরের কি বোঝে রে? নিজেইতো আদর পায়নি।

হি-হি করে হাসে অন্যরা।

খবরদার, চোপ। কেউ হাসবে না।

চুপ করে জায়গা ছেড়ে দেয় সবাই। আবুল লাবনীকে কোলে নেয়ার জন্য হাত বাড়ায়। লাবনী ওর দিকে তাকিয়ে হাসে।

আসো সোনা বোন।

ও লাবনীকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে। লাবনী ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজে দেয়। ওকে উঁচু করে তুলে ধরে চরকির মতো ঘোরায় আবুল।

আশেপাশে জড়ো হওয়া লোকেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন বখাটে ছেলেটা কি সুন্দর করে মেয়েটাকে বুকে তুলে নিয়েছে। সবাই খুশিতে হাততালি দেয়।

সাবাস আবুল, সাবাস।

লাবনী দু'হাতে আবুলের গাল ধরে বলে, সাবাস আবুল, সাবাস।

ওরে দুষ্টু, মুখে দেখি কথাও ফুটেছে। খিদে পেয়েছে তোর?

হ্যাঁ। ও কাঁদতে আরম্ভ করে।

হয়েছে, কাঁদতে হবে না। থাম। কি খাবি বল? বিস্কুট?

হ্যাঁ, বিস্কুট। পানি খাবো।

এই শাজাহান বিস্কুট আর পানি দে।

তোর পকেটে পয়সা আছে তো?

কাল দেবো। তিন সত্যি করছি। এখন পকেট খালি। আমার বোনটা খিদেয় কাঁদবে নাকি?

আবুল সবার দিকে তাকায়। যে যার পকেট হাতড়ে দু-এক টাকা বের করে বিস্কুট আর পানি কিনে দেয়। লাবনীর হাতে বিস্কুট দিলে ও আবুলের মুখে গুঁজে দিয়ে বলে, তুমি আগে খাও।

দেখেছিস ও আদরের মর্ম বোঝে।

লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা বোন আমার।

আবুল ওকে ঘাড়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ভাবে, কোথায় যাবে? মোমেনার কাছে নিয়ে যাবে? হ্যাঁ, মোমেনা ওকে রাখতে পারবে। লাকী, শিল্পী, রুবি, রুমানা, ঝর্ণা কতজন আছে ওকে দেখার। ওরা এভাবে একটা পরিবার গড়ে তুলবে। মাথার উপরে ছায়ার মতো আছে ডাইনি। ডাইনির সবুজ আলোর নিচে ছোটদের খেলাঘর তৈরি হবে। আবুলের মন খুশিতে ভরে যায়। লাবনী ওর ঘাড়ে বসে ওর চুল টানে, গালে হাত বুলিয়ে দেয়। নাক চেপে ধরে। আবুল মনের আনন্দে ভাবে, ও হারিয়ে যাওয়া গ্রামটা ফিরে পেয়েছে– লাবনীর হাসির মধ্যে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে আসা বাতাসের ছোঁয়া পাওয়া যায়। আবুল

বুকভরে শ্বাস টানে। মনে হয় মেলা থেকে একটা পুতুল কিনে বাড়ি ফিরছে ও। পুতুলের ছোট ছোট পা ওর বুকের ওপরে দাপায়। ওর মনে হয় মা বলছে, ঘুমিয়ে পড় বাবা। অনেক রাত হয়েছে।

মায়ের কথা শুনে ও ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ ওর ঘাড়ে একটি সত্যিকারের পুতুল– ওর প্রাণ আছে, ও হাত-পা ছোঁড়ে এবং কথা বলে। মাঝে মাঝে ওর চুল ধরে ঝাঁকুনি দেয়। আবুলের মনে হয় এমন আনন্দ ও কোনোদিন পায়নি। নিজের ছোটবেলাতেই তো বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। তারপর থেকে ওর আর কোনো বাড়ি হয়নি। এবার কি লাবনীকে নিয়ে ওর একটি বাড়ি হবে? এই বয়সে কি এইটুকু শিশুর দায়িত্ব ও নিতে পারবে? আবুল ভীষণ চিন্তায় পড়ে। তখন ভাবে, মোমেনার কাছে গেলে মোমেনা বুদ্ধি বের করতে পারবে। ওদের মধ্যে মোমেনাই সবচেয়ে চটপটে।

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং

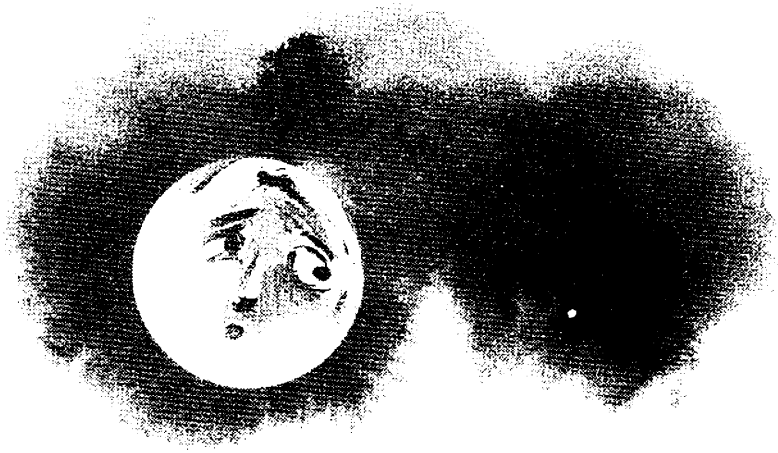

সেই বিকেলে মজুরির টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় মোমেনার মনে হয় আজ ওর খুশির দিন। ওর মন ভালো আজ। রাস্তার মানুষদেরকে খুব আপন মনে হয়। গাড়ি-রিক্সার শব্দে আজ মাথা ধরে না। বাড়ি ফিরে নিশ্চয় নতুন কিছু দেখতে পাবে। ও আনন্দে দোকান থেকে চাল-ডাল-আলু-ডিম কেনে। ও নিজে আজ মা আর হীরনের জন্য খিচুড়ি রান্না করবে। ডিম ভাজি করবে। আলু ভর্তা বানাবে। সুফিয়া ফুপু ওকে আমের আচার দিয়েছিল, সেটা খাবে। উহ্, আজ একটা মজার সন্ধ্যা হবে। পেট ভরে খিচুড়ি খেয়ে টানা ঘুমে রাত কাবার হয়ে যাবে। আনন্দে মোমেনার উড়তে ইচ্ছে করে। মনে মনে ভাবে, পাখির মতো উড়ে বাড়ি ফিরতে পারলে ওর মতো সুখী মেয়ে এই পৃথিবীতে আর একটি পাওয়া যাবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁধের ওপরের ছাউনিতে ফিরে আসে।

দূর থেকে আবুলকে দেখতে পায়। আবুল ওদের ছাউনির কাছে দাঁড়িয়ে লাবনীর সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। মোমেনা ছুটে গিয়ে লাবনীকে কোলে তুলে নেয়।

তুই কে রে? নাম কি?

আমি লাবনী। ওইতো ভাইয়া।

মোমেনা কৌতুকের দৃষ্টিতে আবুলের দিকে তাকায়। বলে, কি রে আবুল, তোর আবার বোন কোথা থেকে এলো?

কুড়িয়ে পেয়েছি। অভাবের জন্য ওর মা ওকে ফেলে রেখে চলে গেছে। এই দেখ চিঠি।

মোমেনা গম্ভীর হয়ে বলে, চিঠি পড়তে হবে না। বুঝেছি। আমাদের সবার মতো ওরও একটা গল্প আছে।

এখন কি করবো মোমেনা?

কি করবি মানে?

লাবনীকে–

ও এই কথা। আমরা সবাই মিলে ওকে দেখাশোনা করবো। আমরা ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ও দেশের প্রেসিডেন্ট হবে।

হা-হা করে হাসে আবুল। হাসতে হাসতে বলে, ও প্রেসিডেন্ট হলে আমি ওর বডিগার্ড হবো।

ঠিক বলেছিস। ভালোই হবে।

তুই কি হবি মোমেনা?

আমি? আমি ওকে বুদ্ধি দেবো। ও যেন অন্যের কথায় না চলে সেটা শেখাবো।

মস্ত কাজ। পারবি তো?

খুব পারবো। দেখিস, তোরাও খুশি হবি।

মনে হচ্ছে ও বোধহয় সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্ট হবে।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে মোমেনা বলে, এটা আমাদের খেলা। স্বপ্নের খেলা রে আবুল। আমাদের জীবনে আর কিইবা আছে!

অনেক বড় জিনিস আছে।

বড় জিনিস? কি সেটা?

কেন ডাইনির সবুজ আলো। ডাইনির সবুজ আলোর জন্যইতো আমরা ডুবতে ডুবতে আবার ভেসে উঠি।

ঠিক বলেছিস। তুই আজ আমাদের সঙ্গে খিচুড়ি খাবি আবুল। এই দেখ বাজার করে এনেছি। আমি রাঁধবো।

কি মজা, আজ আমার আর লাবনীর পিকনিক।

পিতনিত-পিতনিত, লাবনী হাসতে হাসতে ঘুরপাক খায়। ওরা দু'জনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আবুল ওর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে বলে, তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে মোমেনা। মনে হচ্ছে তুই বুঝি চাঁদের দেশ থেকে নেমে এসেছিস।

সত্যি, আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে? আজ যে আমার মনে অনেক খুশি সেজন্য সুন্দর লাগছে– আনন্দে থাকার সুন্দর। লাবনীকে দেখেই আমার খুশির মাত্রা বেড়ে গেছে।

আবুল খানিকটা লজ্জা পায়। বলে, তোর জন্য কিছু করতে হবে?

হ্যাঁ, চাপকল থেকে এক বালতি পানি নিয়ে আয়। আমি রান্না শুরু করবো।

বালতি দে। আর শোন লাবনীকে দেখবি। ও আবার রিক্সার নিচে না পড়ে।

ও তোর একার না। ও আমাদের সবার।

তা ঠিক। তবে আমার দাবি বেশি। দে বালতি দে।

মোমেনা বালতি আনতে ঘরে গেলে সবুজ আলোয় ভরে যায় ওদের চারপাশ। মোমেনা মৃদু হেসে বলে, ডাইনি আমরা একটা বোন পেয়েছি।

জানিতো।

ওকে দেখতে এসেছিস?

হ্যাঁ, তাইতো এলাম। তুই পানি নিয়ে আয় আবুল। আমিও খিচুড়ি খাবো। মোমেনার রান্নায় আজ–

হয়েছে, হয়েছে থাম ডাইনি। তুই লাবনীকে দেখ। আমি কাজে গেলাম।

আবুল বালতি নিয়ে চলে গেছে। মোমেনা চুলোয় খিচুড়ি বসিয়েছে। আর বাইরে সবুজ আলোর নিচে ভরে গেছে পথশিশুরা। ওরা কলকল করছে। লাবনীকে পেয়ে ওদের খুশির অন্ত নেই। ওদের কচিকণ্ঠ শুনে মোমেনা পলিথিন সরিয়ে বাইরে উঁকি দেয়। গাদা গাদা ছেলেমেয়ে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বলে, এখন আমি কি করবো? এত বাচ্চাদের কি খেতে দেবো?

আকলিমা বলে, তোকে এত ভাবতে হবে না মোমেনা।

তুই ওদের খাওয়াবি ডাইনি?

হ্যাঁ, খাওয়াবোতো।

কি খাওয়াবি? রাঁধবি কখন?

রাঁধব কেন। ওদের সবুজ আইসক্রিম খাওয়াবো।

ওতে পেট ভরবে?

পেট ভরে টইটুম্বুর হয়ে যাবে।

যাক, বাঁচালি। আমিতো ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি এখন সবুজ আলোর ভেলায় করে ওদেরকে বাঁধের ওপারে নিয়ে যাচ্ছি। লাবনীকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা সারা রাত খেলবে।

তারপরে?

তারপরে যে যার কাজে যাবে। কাজ না করলে ছেলেমেয়েরা খাবে কি?

লাবনীর কি হবে?

ও তোর সঙ্গে থাকবে।

আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ তোর সঙ্গে। তুই ইট ভাঙবি, আর ও গাছের ছায়ায় খেলবে, নয়তো ঘুমিয়ে থাকবে। নয়তো তোর সঙ্গে ইট ভাঙবে।

যাহ্, ওইটুকু বাচ্চা ইট ভাঙবে কি! ডাইনি তুই মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর কথা বলিস।

যে বাচ্চাকে মা ফেলে চলে যায়–

হয়েছে থাক থাক ডাইনি।

ঠিক আছে আমি গেলাম। তুই, আবুল আর হীরন তোর মা ঘুমুলে মাঠে আসিস।

আচ্ছা।

মোমেনা ঘাড় কাত করে। দেখতে পায় সবুজ আলোয় ভেসে চলে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ ও অবাক হয়। শুনতে পায় কারা যেন বলছে, দেখো দেখো পৃথিবীতে কি অদ্ভুত সবুজ আলোর ভেলায় ভেসে চলে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। চাঁদের বুড়ি ওদের তুমি বেড়াতে নিয়ে এসো।

ঠিক আছে, ডাইনি বুড়ির কাছে ওদের জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাবো।

মোমেনার মনে হয় ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চাঁদের গোলাকার বৃত্তের মধ্যে ফুলের মতো ফুটে আছে ছোটদের মুখ।

পানির বালতি নিয়ে ফিরে আসে আবুল। মোমেনাকে বলে, কি দেখছিস?

পূর্ণিমার চাঁদ।

বালতি রেখে আবুল বলে, আমিও মাঝে মাঝে অনেক রাত জেগে পূর্ণিমার চাঁদ দেখি। বেশ লাগে দেখতে। মন ভরে যায়।

তুই চাঁদে অনেক মুখ দেখতে পাস না?

নাতো।

এখন থেকে তুই দেখতে পাবি।

কেন? আবুল চোখ কপালে তোলে।

তুই যে লাবনীকে কোলে তুলে নিয়েছিস সেজন্য দেখতে পাবি। তোর এই ভালো কাজের জন্য তোর পেছনের সব দোষ মুছে গেছে রে আবুল।

সত্যি?

হ্যাঁ, আমি বলছি সত্যি। ওই যে আমার মা আসছে। মা যদি তোকে বকাবকি করে তবে তুই কিছু বলবি না। চুপ করে থাকিস। মা ভাবে, তুই হীরনকে তোর সন্ত্রাসীদের দলে ভেড়াতে পারিস।

আবুল চুপ করে থাকে। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। পরক্ষণে ঝেড়ে ফেলে মন ভালো করে। ভাবে, ওতো নিজের পথ নিজে নষ্ট করেছে। দায়তো ওরই। এখন থেকে ও নিজেকে ঠিক করবে। ডাইনিকে বলবে ওকে হেলালের হাত থেকে উদ্ধার করে দিতে।

ততোক্ষণে মোমেনার মা কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরলেও ওকে দেখে মারমুখী হয়ে ওঠে।

তুই এখানে কেন এসেছিস আবুইল্যা?

আমার খিদে পেয়েছে চাচী।

ভেবেছিস খিদের কথা বললে আমি ভুলে যাবো? তোর বড়ভাইরা তোকে পোলাও-কোর্মা খেতে দেয় না শয়তান? যা এখান থেকে।

আবুল কথা না বলে মুখ নিচু করে রাখে।

দাঁড়িয়ে আছিস যে? যেতে বললাম না।

ও মুখ নিচু করে বলে, আমার মা নেই।

মিথ্যে কথা বলছিস শয়তান। গাঁয়েতো মা আছে বাপ আছে। পালিয়েছিলি কেন? মাস্তানি করার জন্য ধন্দ লেগেছিল তোর? এখন এসেছিস আদর কুড়াতে? যা ভাগ বলছি।

মর্জিনা রুষ্ট ভঙ্গিতে তেড়ে ওঠে। আবুল দাঁড়িয়েই থাকে। ছাউনির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে মোমেনা। হাসতে হাসতে বলে, মা আজ একটা দারুণ ঘটনা ঘটেছে।

তুই আবুইল্যার জন্য সাফাই গাইবি নাকি? ওকে আমি পথে রাখার চেষ্টা করি নাই, বল? ও কি আমার কথা শুনেছে? বিপথে গেছে। বান্দর একটা।

মা ও লাবনীর দায়িত্ব নিয়েছে।

লাবনী? মর্জিনা ভুরু কোঁচকায়।

আবুল তড়িঘড়ি গড়গড়িয়ে বলে, লাবনীর মা অভাবের জন্য ওকে একটা দোকানে রেখে চলে যায়। লাবনী খুব কান্নাকাটি করছিল। ওর চারপাশে অনেক লোক জমে যায়। ওর মা একটা চিঠি লিখে রাখে। ওর মা বলেছিল কেউ যেন ওকে লালন-পালন করে। যারা জড়ো হয়েছিল তারা কেউ ওর দায়িত্ব নিতে চায়নি। আমি নিয়েছি। আমরা পথশিশুরা ওকে পালবো।

মর্জিনা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর কথা শুনছিল। ওর কথা শেষ হলে জড়িয়ে ধরে বলে, তোর কলজেটা এত বড় রে আবুল, ওরে আমার মানিক। সোনা তোর খিদে পেয়েছে। এই দেখ চাল-ডাল-ডিম কিনে এনেছি। আজ তোকে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবো। লাবনী কৈ?

ওই যে ওইদিকে। রুবি-শিল্পী নিয়ে গেছে।

মোমেনা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, লাবনীকে পেয়ে সবাই খুব খুশি আম্মা।

তুই এখানে বোস বাবা।

তোমার কষ্ট করতে হবে না মাগো। আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি। তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। হীরন ফিরলেই আমরা সবাই মিলে খিচুড়ি খাবো।

আমি চাচীর জন্য এক বালতি পানি নিয়ে আসি?

হ্যাঁ, নিয়ে আয়। দাঁড়া আমি তোকে বালতি দিচ্ছি।

বালতি দেয়ার সময় মোমেনা ফিসফিসিয়ে বলে, আর খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশিস না আবুল। লাবনীর জন্য তোকে অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে।

জানি। আজ থেকে আমার জীবন অন্যরকম হবে। প্রতিজ্ঞা করছি। তুই সাক্ষী।

মোমেনা দেখতে পায় আবুলের চোখমুখ সবুজ আলোর আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রতিজ্ঞার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখমুখ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। ও শিস বাজাতে বাজাতে বালতি নিয়ে চলে যায়।

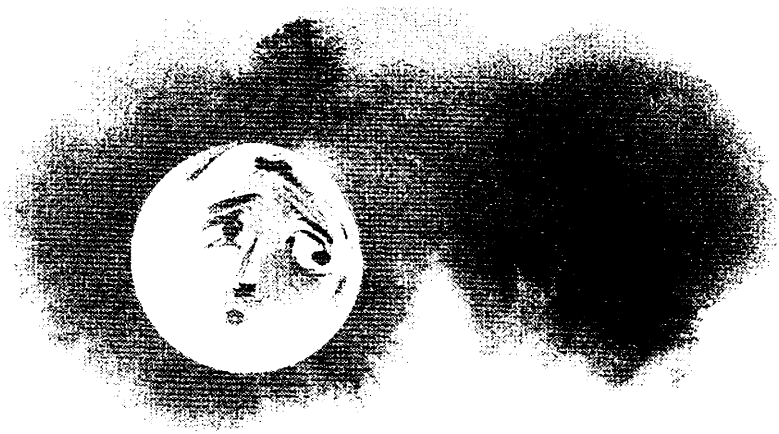

মধ্যরাতে যখন চাঁদটা পূর্ণিমার আলোতে ভরে দিয়েছে মাঠ-প্রান্তর তখন ডাইনির সবুজ আলো গায়ে মেখে ছেলেমেয়েরা লাবনীর সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। ডাইনি সবাইকে একটি করে সবুজ রঙের আইসক্রিম দেয়। আবুল লাবনীর আইসক্রিমটা লুকিয়ে রেখে বলে, লাবনী আইসক্রিম খাবে না।

না, আমি আইসক্রিম খাবো। আমাকে আইসক্রিম দাও ভাইয়া।

শিল্পী দুষ্টুমি করে বলে, লাবনী তো আইসক্রিম খায় না।

খাই, খাই, অনেক খাই।

ওর কথা শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লে লাবনী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে ওর হেঁচকি ওঠে। সবাই মিলে ওর সামনে একটি করে আইসক্রিম তুলে ধরে। হঠাৎ ওর কান্না থেমে যায়। ও ফিক করে হেসে দু'হাতে চার-পাঁচটা আইসক্রিম ধরে। তারপর সবগুলো আবুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, এগুলো সব ভাইয়ার।

আরে দেখেছো কাণ্ড, বলে কিনা সব ভাইয়ার। শিল্পী ওর মুখের ওপর আঙুল নাড়ায়। দেবো মাথা ফাটিয়ে দুষ্টু মেয়ে।

ও কারো দিকে তাকায় না। সবগুলো আইসক্রিম আবুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, ভাইয়া নাও। তুমি সব খাও।

তুই খাবি না টুনটুনি?

আমি একতা খাবো। খাই ভাইয়া?

তুই একটা খা।

আবুল লাবনীকে একটা দিয়ে বাকিগুলো অন্যদের দিয়ে দেয়।

আইসক্রিম খাওয়া হলে সবাই মিলে আকলিমাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে। আকলিমা ওর সবুজ আলোয় সবাইকে আড়াল করে দেয়। ছেলেমেয়েদের মনে হয় চারদিকে মিষ্টি গন্ধে ভরে গেছে। মোমেনা বলে, বাহ্ সবুজ আলোর গন্ধটাতো দারুণ সুন্দর। ডাইনি আমি তোকে একটু শুঁকে দেখবো?

ডাইনি হেসে বলে, আমাকে শুঁকবি কেন? নিজের হাতটা নাকের কাছে ধরে দেখ।

মোমেনা নাকের কাছে হাত ওঠালে অন্যরাও ওঠায়। সবাই একসঙ্গে বলে, কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ।

তোরা কি কাঁঠালিচাঁপা ফুল খেয়েছিস?

নাতো।

নাম শুনেছিস?

নাতো। আমরাতো রাস্তার ছেলেমেয়ে।

তুমি আমাদের এমন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছো কেন ডাইনি?

ফুলটাতো দেখিসনি। গন্ধটা বুঝলি কি করে?

নিজেদের শরীর থেকে।

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে কথা বললে হা-হা করে হাসে আকলিমা। হাসতে হাসতে বলে, তোরা পথেঘাটে বড় হলে কী হবে তোদের শরীর ফুলের গন্ধভরা।

ইস, কি সুন্দর কথা।

মোমেনা আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে। লাবনী দু'হাতে ওকে টানতে টানতে বলে, সরো, সরো। আমি দাইনির কোলে বসবো।

ভাগ, উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস। যা, এখান থেকে। ভাগ।

লাবনী ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে ওকে ভেংচি কাটে। অল্পক্ষণে ওদের মনে হয় কান্না নয়, লাবনী চমৎকার গান গাইছে। ওর কচিকণ্ঠ অপূর্ব সুরেলা। লাবনী এখন কিশোরী– গান গেয়ে মাতিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। ছেলেমেয়েরা ওর গানের সঙ্গে গলা মেলায়। কোথাও আকলিমার কোলে বসে থাকা ছোট্ট লাবনী নেই। ওর যেন পাখা গজিয়েছে। ও মনের সুখে উড়ছে আর গান গাইছে। সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত।

মোমেনা বলে, কি সুন্দর বৃষ্টি নেমেছে।

আবুল দু'হাত উপরে তুলে ঘুরপাক খেতে খেতে বলে, আমাদের গায়ে টুপটুপ করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরছে। কিন্তু আমরা ভিজে যাচ্ছি না।

মোমেনা হাততালি দিয়ে বলে, বুঝতে পারছি বৃষ্টি বাতাসের মতো আমাদের সঙ্গে মাখামাখি খেলা খেলছে। আমরা বৃষ্টি ছুঁতে পারছি না। দেখতে পাচ্ছি না। চারদিক ধোঁয়াটে করে বৃষ্টি ভাসিয়ে দিচ্ছে না আমাদেরকে।

আকলিমা হাসতে হাসতে বলে, বলতো এটা কিসের বৃষ্টি?

কেউ একজন পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে, বৃষ্টি আবার কিসের হবে? বৃষ্টিতো বৃষ্টিই। ডাইনি তুই বল কিসের বৃষ্টি?

আকলিমার হাসি ফুরোয় না। বলে, এটা সুরের বৃষ্টি। লাবনী সবার জন্য সুরের বৃষ্টি নিয়ে এসেছে।

হুররে, সুরের বৃষ্টি।

তাইতো এত সুন্দর।

তাইতো এত মায়া।

তাইতো এমন করে প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।

মোমেনা আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, পথঘাটে-বস্তিতে বড় হলেও আমাদের জীবনটা ধন্য রে ডাইনি।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। আমাদের জন্যও ফুলের গন্ধ আছে, সুরের বৃষ্টি আছে। আর কি আছে ডাইনি?

তোরাই খুঁজে দেখ আর কি আছে। দেখবি চারদিকে থাকার শেষ নেই।

মহুয়া ভুরু কুঁচকে বলে, কষ্টটা একটু বেশি আছে তাই না ডাইনি?

আবুল তুড়ি মেরে বলে, ওটাইতো আমাদের ফুলের গন্ধ। ওই গন্ধটুকু পেলে আমাদের কষ্ট দূর হয়।

মোমেনা আবুলের পিঠে চাপড় দিয়ে বলে, বোকা, কষ্টটাই আমাদের ফুলের গন্ধ। আমাদের সুরের বৃষ্টি। নইলে যে মা অভাবের জন্য লাবনীকে ফেলে যায় সেই লাবনীর গলায় এমন সুর উঠতে পারে?

মোমেনার কথার পিঠে কেউ আর কথা বলে না। সবাই স্তব্ধ দাঁড়িয়ে কান পেতে গান শোনে। ওদের মনে হয় আশ্চর্য গানের ধ্বনি এই মুহূর্তে ওদেরকে ছেয়ে ফেলেছে। ওরা আস্তে আস্তে অন্য কোনো গ্রহে চলে যাচ্ছে। বাতাসের সমুদ্রে পক্ষিরাজ নৌকায় উঠেছে ওরা। নৌকার হাল ধরে আছে ডাইনি। সবচেয়ে ছোট রুমু জিজ্ঞেস করে, ডাইনি আমরা কোথায় যাচ্ছি?

আকলিমার হাসিতে চাঁদের আলো ভর করে। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে বলে, ডাইনি তোকে পরীর মতো লাগছে।

আকলিমার কোলে বসে লাবনী জিজ্ঞেস করে, পরী কি? আমি পরী খাবো।

ছেলেমেয়েরা হো-হো করে হাসে। আকলিমা লাবনীর গাল টেনে বলে, এই যে এই মেয়েটা পরী।

কি মজা, কি মজা আমি পরী।

রন্টি ওর পা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, তাহলে এখন তুই পরী খা। তোকে খা।

না, আমি আমাকে খাবো না।

আবার সবাই হাসে। শান্তা ওর দু'হাত উপরে তুলে বলে, তাহলে তুই আকাশে উড়ে যা। দেখ দেখ তোর দুটো ডানা গজিয়েছে। তোকে কি সুন্দর লাগছে।

ডাইনি এখন কি করবি?

আমরা উড়ে যাবো।

কোথায় যাবো? চাঁদে?

আবুলের প্রশ্নের উত্তরে আকলিমা বলে, না। আমরা নতুন জায়গায় যাবো।

কোথায় যাবো বলবেতো?

বলবো না। চল যাই।

সবুজ আলোর ভেলায় চড়ে ছেলেমেয়েরা যেখানে এসে নামে সে গ্রহের নাম গ্লিসভ ৮১। চারদিকে তাকিয়ে ওরা মুগ্ধ। ক্ষীণকায় পানির নহর রুপালি ফিতার মতো ছড়িয়ে আছে। সবার আগে দৌড়াতে থাকে লাবনী। ওর পায়ে যেন হরিণের গতি ভর করেছে। আবুল ওর পিছে পিছে ছুটে যায়, ডাকে। বলে, ফিরে আয় লাবনী। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

ও মুখ ঘুরিয়ে বলে, দানি না। আমি যাই।

হারিয়ে যাবি না তো?

লাবনীর মুখে কথা নেই। আকলিমা বলে, হারাবে না। ওকে যেতে দে আবুল। ও ওর মাকে খুঁজতে যাচ্ছে।

মাকে খুঁজতে? ওর মাকে ও কোথায় খুঁজবে?

আকাশে, বাতাসে, পাতালে– সবখানে।

খুঁজে পাবে?

আকলিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বললে না যে ও কি খুঁজে পাবে?

পাবে না। কোনোদিনও পাবে না। তারপরও সারা জীবন খুঁজবে লাবনী। ওর বুকের ভেতর থেকে ওর মা কোনোদিন হারিয়ে যাবে না।

আবুলের কান্না পায়। ওর চোখ জলে ভরে ওঠে। দু'হাতে চোখ মুছে বলে, আমিও আমার মায়ের কাছে যাবো ডাইনি।

যাবি, যাবি আমি তোকে নিয়ে যাবো।

আমিতো গ্রামের নাম ভুলে গেছি।

ভয় নেই। আমি জানি তোর গ্রামের নাম কি।

আবুল আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে, ডাইনি তুই আমার সোনামণি।

সবাই ঘুরতে চলে গেছে। তুইও যা আবুল।

তুই কি করবি ডাইনি?

আমি এখানে সবুজ আলো জ্বালিয়ে বসে থাকবো।

আলোর সুতোর টান দিলে সবাই এখানে ফিরে আসবি।

তাহলে গেলাম।

আবুল ছুট দেয়। কয়েক লাফে পেরিয়ে যায় কয়েকশ মাইল। প্রথমে ও লাবনীকে খোঁজে। কিন্তু ওকে কোথাও দেখতে পায় না। তারপরে ও মোমেনাকে খোঁজে। ওর খুব ইচ্ছে হয় যে এই নতুন গ্রহে ও মোমেনার হাত ধরে ঘুরে বেড়াবে। একসময় ও দেখতে পায় মোমেনাকে। জলের ক্ষীণ স্রোতের পাশে বসে ও সোনালি নুড়ি জমিয়ে একটি স্তূপ বানিয়েছে। সেই স্তূপের মাথায় একটি

চমৎকার ফুল ফুটে আছে। ফুলটা অবিকল মোমেনার মুখের মতো। ও মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে এমন একটি অসাধারণ দৃশ্যের দিকে। বারবার মনে হয় পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো, সন্ত্রাসীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ছেলেটির এমন দৃশ্য দেখা মানায় না। ওর খুব দুঃখ হয় নিজের জন্য। ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। কেমন করে মোমেনার সামনে যাবে, মোমেনা যে ফুলের মতো মেয়ে। আর ও নিজে একটা ড্রেনের পোকা। আবুল ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণায় চিৎকার করে ডাকে, মোমেনা!

মোমেনা ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে ছুটে আসে।

কি হয়েছে রে আবুল?

তুই ওখানে বসে কি করছিস?

নুড়ি নিয়ে খেলছি।

আমিও খেলবো।

খেলবিতো আয়। এমন করছিস কেন? কি হয়েছে?

আমি তোর হাত ধরি?

ধর। মোমেনা ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমার ইচ্ছে করছে তোর হাত ধরে এই নতুন গ্রহটায় ঘুরে বেড়াতে। আমার মনে হচ্ছে ডাইনি আমাদেরকে একটা নতুন দুনিয়া দেখাচ্ছে।

ডাইনি আমাদেরকে খাঁটি মানুষ হতে শেখাচ্ছে রে আবুল।

ঠিক বলেছিস।

আয় আমরা জলের ধারার পাশে বসি। জল ছুঁলে আমার ভেতরটা ধুয়ে যায়।

তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি বুঝিস।

মোমেনা খিলখিল করে হাসে। আবুল ওর হাতটা শক্ত করে ধরে। মোমেনার হাসিটা ওর কাছে খুব পবিত্র। ওর মনে হয় জল নয়, মোমেনার হাসি ওর ভেতরটা ধুয়ে দিচ্ছে। দু'জনে এসে জলের ধারায় পা ডুবিয়ে বসে।

তোর হাসি খুব সুন্দর রে মোমেনা।

মোমেনা দ্বিগুণ হাসিতে চারদিক মাতিয়ে তুলে বলে, সুন্দর তো তোর কাছে মনে হবে। তোর কানে যে জলের শব্দ ঢুকছে।

শুধু জলের শব্দ হবে কেন, তোর হাসিও ঢুকছে মোমেনা।

আচ্ছা তোর কি হয়েছে বলতো?

মোমেনার এমন কথায় আবুলের খুব মন খারাপ হয়। মোমেনা ওকে বুঝতেই চাইছে না। কেবল অন্য কথা বলেই যাচ্ছে, যেন আবুল নামের ছেলেটা ওর খেলার পুতুল।

দেখ দেখ আবুল কি সুন্দর এক ঝাঁক সবুজ মাছ ভেসে আসছে।

তোর মনে খুশি আছে তুই দেখ।

তোর মনে খুশি নেই?

না নেই।

বলবিতো কি হয়েছে?

তোকে বলা আর ওই পাথুরে খণ্ডটাকে বলা এক কথা!

ও আচ্ছা, দেখিতো সোনামানিকের চেহারা।

মোমেনা ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। দেখতে পায় আবুলের চেহারা গ্লিসভ ৮১র মতো ছোটবড় পাথর খণ্ডে ভরা– যেন কতকাল সে কপালে মায়ের চুমু পড়েনি। কপালটা ফেটে রুক্ষ হয়ে আছে। মোমেনার ভীষণ মায়া লাগে। বলে, আবুল আমরা কষ্ট ভোলার জন্য অনেক চেষ্টা করি। কষ্ট আমাদের ছেড়ে যায় না রে।

ছেড়ে যাবে কেন, কষ্ট আমাদের ভালোবাসে যে। আমি কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

তাহলে মন খারাপ করিস কেন?

দেখ দেখ মাছগুলো আমাদের কাছে চলে এসেছে। ইস কি সুন্দর! সবুজ আঁশ থেকে সোনালি আলো ঠিকরে পড়ে জলের রেখায় আলো ফেলেছে। মোমেনা আয় আমরা মাছগুলো ধরি।

না, এইসব মাছ ধরা যাবে না।

কেন ধরা যাবে না?

ডাইনি রাগ করবে। বলবে বেড়াতে এসে আমরা এই গ্রহের সুন্দর জিনিস নষ্ট করেছি।

হ্যাঁ, তা হতে পারে। তাহলে থাক।

তখন ওরা দেখতে পায় চারদিক থেকে ছুটে আসছে ছেলেমেয়েরা। সবার আগে লাবনী।

ভাইয়া তোমরা কি একঝাঁক সবুজ-সোনালি মাছ দেখেছো?

দেখেছিতো। তোরাও দেখেছিস?

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি। আমরা সবুজ-সোনালি ছেলেমেয়েদেরকেও দেখেছি।

কোথায় ওরা? আবুল আর মোমেনা উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে।

ওই পাহাড়ের ওইদিকে। ওরা আমাদেরকে দেখে লুকিয়ে আছে।

মোমেনা চল আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি।

শিল্পী দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দেয়।

না যেও না। ওরা আমাদেরকে ভয় পায়।

আমাদেরকে দেখে দৌড় দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে। বেশি ছোট যারা তারা তো ভয়ে কাঁদছিল।

কেন ভয় পেল? আমরা কি এতই খারাপ?

আবুলের এই প্রশ্নে সব ছেলেমেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কারো মুখে কথা নেই।

একজন কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, সত্যি বোধহয় আমরা খারাপ।

ঠিক আছে, এক কাজ করি।

মোমেনা পানির ধারার দিকে তাকায়। দেখতে পায় সোনালি-সবুজ মাছের ঝাঁক নেই।

কি কাজের কথা তুমি বলতে চেয়েছিলে মোমেনা আপু?

বলছিলাম কি চল এই পানির মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ধুয়ে নেই। ওদের পানি গায়ে মেখে আমরা পৃথিবীতে ফিরে যাবো। এটাই হবে ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব।

ঠিক, ঠিক।

ছেলেমেয়েরা লাফালাফি করে এক-একজন এক-একটা পানির ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনের আনন্দে পানি ছিটায়। কতক্ষণ সময় যে ওদের কেটে যায় ওরা জানে না। মোমেনার মনে হয় কয়েকশ বছর কেটে গেল। ওরা আর ওরা নেই, ওদের মধ্যে অন্য সময়ের মানুষ ঢুকে গেছে। চারদিকে কি সুন্দর আলো, যেন চাঁদনি রাত। চারদিকে কি সুন্দর রোদ, যেন শরতের আকাশ। চারদিকে কি সুন্দর গন্ধ, যেন সব ফুল ফুটে গেছে। হঠাৎ ওদের মনে হয় ডাইনির সবুজ আলোর রশ্মি ওদের কাছে পৌঁছে গেছে। ওরা বুঝে যায় যে ডাইনি ওদের ডাকছে। ছেলেমেয়েরা পানির ধারা থেকে হাঁসের মতো গা-ঝাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। কি ঝরঝরে লাগছে নিজেদের।

ওরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে দৌড়াতে থাকে। ডাইনির সবুজ আলো ওদের পথ দেখায়। ডাইনির কাছে পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা খেয়াল করে চারদিক থেকে সবুজ ছেলেমেয়েরা ছুটে আসছে ওদের দিকে। পাথরের আড়াল থেকে, গুহা থেকে শয়ে শয়ে বেরিয়ে আসছে।

আবুল আতঙ্কে বলে, ওরা কি আমাদের মারবে?

ডাইনি মৃদু হেসে বলে, না।

তাহলে কি বন্ধু হবে?

হ্যাঁ, ওরা তোদেরকে জলের সুতো দেবে।

মোমেনা খুশিতে হাততালি দিয়ে বলে, বুঝেছি. বুঝেছি। আমরা ওদের নদীর পানি গায়ে মেখেছি বলে–

আকলিমা মোমেনার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, ঠিক বুঝেছিস। ওদের জলের ধারাগুলোই হলো ওদের ভালোবাসা।

তখন সবুজ ছেলেমেয়েরা এসে ওদের ঘিরে ধরে দাঁড়ায়। একজন মোমেনার দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা আমাদের বন্ধু। এই নাও আমাদের ভালোবাসার মালা। তোমরা গলায় পরো।

ওরা সবাইকে রুপালি জলের মসৃণ সুতোর মালা দেয়। প্রত্যেকে গলায় পরে। লাবনী আবুলের হাত ঝাঁকিয়ে বলে, ভাইয়া দেখো আমাকে কি সুন্দর লাগছে।

তুই আমাদের ছোট্ট সোনা খুকুমণি।

জানো আমার কি মনে হচ্ছে ভাইয়া।

বল কি?

আমি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছি।

মোমেনা ওর থুঁতনি নাড়িয়ে দিয়ে বলে, ওরে আমার পাকনা বুড়ি।

ততোক্ষণে অন্যরাও বলতে থাকে, আমাদেরও মনে হচ্ছে আমরা কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা তা খুঁজে পেয়েছি।

সবাইকে মালা দেয়া হলে সবুজ ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বলে, তোমরা আমাদের বন্ধু। আবার বেড়াতে এসো।

তোমরাও আমাদের বন্ধু। তোমরা আমাদের পৃথিবীতে বেড়াতে এসো। আমরাও তোমাদেরকে ভালোবাসার মালা দেবো।

সবুজ ছেলেমেয়েরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না।

আবুল বলে, তোমরা কথা বলছো না কেন? আসবে না আমাদের বাংলাদেশে?

ওরা তখনও চুপ করে থাকে।

মোমেনা বলে, আমাদের দেশে আম হয়। আমরা তোমাদেরকে আম খাওয়াবো।

তোমাদেরকে আমরা ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত দেবো। তোমাদের ইচ্ছে হলে পান্তাভাত, নয়তো গরম ভাত খেতে পারো। যাবে আমাদের দেশে?

সবুজ ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মাথা নাড়িয়ে বলে, না যাবো না।

কেন যাবে না?

তোমাদের কত কষ্ট। তোমরাইতো ঠিকমতো খেতে পাও না।

তোমরা কি করে জানলে?

আমরা এখান থেকে সব দেখতে পাই।

মোমেনা চিৎকার করে ডাকে, ডাইনি।

আকলিমা মৃদু হেসে বলে, কি হয়েছে?

তুই ওদেরকে আইসক্রিম খেতে দে।

আকলিমা মৃদু হাসলে সবুজ আলোয় ভরে যায় চারদিক। বৃষ্টির মতো ঝরতে থাকে সবুজ আইসক্রিম। ছেলেমেয়েরা যার যত খুশি আইসক্রিম দু'হাত ভরে নেয়। সবাই মিলে গোল হয়ে বসে।

আইসক্রিম খেতে খেতে সবার সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব হয়। সবুজ ছেলেমেয়েরা হাত মিলিয়ে বলে, তোমাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব হলো।

তাহলে যাবে আমাদের দেশে বেড়াতে?

হ্যাঁ, যাবো।

পূর্ণিমার রাতে আমরা তোমাদের সঙ্গে কানামাছি খেলবো।

বিলের জলে সাঁতার কাটবো।

আমরা বকুল ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথবো।

সবুজ ছেলেমেয়েরা বলে, তোমরাতো ভারি সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পারো। আমরা তোমাদের কাছে স্বপ্ন দেখতে শিখবো।

তোমরা এলে আমরা খেলতে খেলতে বড় হবো। বন্ধুরা তোমরা এসো কিন্তু।

সবুজ ছেলেমেয়েরা ঘাড় কাত করে। দেখতে পায় ডাইনির সবুজ ভেলায় ওদের বন্ধুরা চড়ে বসলে ভেলাটা ভেসে যেতে থাকে। ওরা হাত নাড়ে।

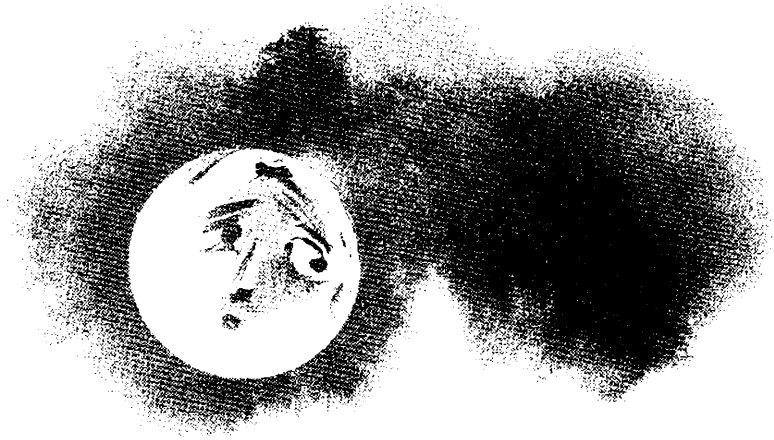

সকালে ঘুম থেকে উঠে মোমেনা বলে, আজ আমার একদম অন্যরকম লাগছে মা।

মর্জিনা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, কাজে যাবি না?

কেন যাবো না? যাবোইতো।

ও। মর্জিনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

তুমি কি ভেবেছিলে আমি কাজে যাবো না?

সেরকমইতো মনে হলো। তোর অন্যরকম লাগছে। মানে–

মানে আমার খুব ভালো লাগছে মাগো। তুমি আমাকে এই দুনিয়াতে এনেছ। সেজন্য আমি তোমাকে সালাম করবো।

বলতে বলতে মায়ের পা ধরে সালাম করে মোমেনা।

হয়েছে কি তোর বলতো? ওই আবুল ছোঁড়াটা কি তোর মাথা ঘুরিয়েছে?

ছিঃ ছিঃ কি যে বলো মা। তোমার কি হয়েছে বলতো?

আমার আবার কি হবে, আমার জীবনে কি শান্তি আছে।

তোমাকে আমাদের মতো স্বপ্ন দেখাতে পারলে তুমি শান্তি পেতে। কিন্তু তাতো হবে না। তুমিতো ডাইনির সবুজ আলোর নিচে যেতে পারবে না।

কি পাগলের মতো কথা বলিস। যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়। পান্তা দেবো।

পান্তার সঙ্গে পোড়া মরিচ আর পেঁয়াজ?

তো আবার কি?

আমিতো বলিনি খাবো না? পেঁয়াজ আর পোড়া মরিচ দিয়ে পান্তা খেতে আমার ভালোই লাগে। যাই হাতমুখ ধুয়ে আসি।

ওর মা খানিকটা অবাক হয়ে মেয়েকে দেখে। ভাবে, মেয়েটাকে খুশি খুশি লাগছে। মনে হয় ও যেন আনন্দের কিছু খুঁজে পেয়েছে। সেটা টাকা না, অন্যকিছু। কি? ওর মা মনের মধ্যে প্রশ্ন নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অপেক্ষা করে মেয়ের ফিরে আসার।

হাতমুখ ধুয়ে টলটলে চেহারা নিয়ে ফিরে আসে মোমেনা। গুনগুন করে গানও গাইছে।

মা তুমিতো দেখছি দাঁড়িয়েই আছ। আমার ভাত?

পান্তাতো হাঁড়িতে আছে। মরিচ পুড়িয়েছি, পেঁয়াজও কেটেছি। যা খেয়ে নে।

হীরন কৈ? ওঠেনি?

না। এখনও ঘুমাচ্ছে।

তুমি ওকে বেশি লাই দাও মা।

মর্জিনা মৃদু হেসে বলে, ও ছোট না। আয় ভাত খাবি। ছোট ভাইকে কি হিংসা করতে হয়?

হয়। মা যদি দুই চোখে দুইজনকে দেখে তাহলে হয়।

ওমা, একি কথা!

ঠিকই কথা মা।

ও না হয় একটু বেশিই ঘুমায়। তাই বলে তুই এটা বলবি?

মোমেনা মায়ের কথার জবাব না দিয়ে চটের পর্দা সরিয়ে খুপরির ভেতরে ঢোকে। দেখতে পায় হীরন মাদুরের ওপর শুয়ে পা নাড়াচ্ছে। মোমেনাকে দেখে ফিক করে হেসে বলে, তোকে আমি স্বপ্নে দেখেছি।

সত্যি! মোমেনা ওর কাছে গিয়ে বসে।

হ্যাঁ বুবু সত্যি।

কি স্বপ্ন দেখেছিস রে?

দেখেছি তুমি আর আমি সোনালি-সবুজ মাছ ধরছি গামছা দিয়ে– কি মজা যে লাগছিল। মাছ ধরতে ধরতে আমরা পানির ভেতরে ডুবে গিয়েছিলাম। নিচে গিয়ে দেখি সেখানে মাছেদের ঘরবাড়ি। মাছেরা আমাদেরকে সবুজ-শ্যাওলার ওপরে বসতে দিয়েছিল। আর হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমরাতো আমাদেরকে ধরতে পারবে না। আমাদের বন্ধুরা তোমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। দেখো তোমাদের গামছায় একটাও মাছ নাই। তুমি আর আমি গামছার দিকে তাকিয়ে অবাক! আর তখুনি আমার ঘুম ভেঙে যায়।

হা-হা করে হাসতে হাসতে মোমেনা বলে, খুব সুন্দর স্বপ্ন। আমার সোনামণি ভাইরে।

বুবু, আমরা যদি মাছগুলো আনতাম তাহলে আমার খুব খারাপ লাগতো।

হ্যাঁ, আমারও লাগতো।

মাছগুলো আনলে ওগুলো মরে যেতো, না বুবু?

হ্যাঁরে ঠিক বলেছিস। আয় তুই আর আমি প্রতিজ্ঞা করি যে আমরা খারাপ ছেলেমেয়ে হবো না। যাদেরকে মারার দরকার নেই তাদেরকে মারবো না।

হীরন লাফিয়ে উঠে মোমেনার গলা জড়িয়ে ধরে।

আমার সোনার বুবু।

ওদের মা কাছে এসে বলে, কি রে মোমেনা, কি হচ্ছে? একটু আগে না তুই ওকে হিংসা করলি।

তোমার কাছ থেকে ভাগে বেশি পেলে আমিতো হিংসে করবো মা। তাই বলে আমার কাছ থকে ওর পাওনাটুকু দেবো না?

ওরে বাব্বা, আমার মেয়েটার কত যে বুদ্ধি।

দু ভাইবোন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'জনে একসঙ্গে বলে, আমাদের জন্য তুমি আছো। আমাদের কোনো দুঃখ নেই।

তখন গাছতলায় বসে লাবনীর কান্না থামাতে পারে না আবুল। লাবনী বারবারই বলে, আমি মায়ের কাছে যাবো। আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে তলো ভাইয়া।

আবুল ওকে দুটো লজেন্স দিয়ে বলে, এগুলো খা। আমি বিকেলে তোকে মায়ের কাছে নিয়ে যাবো।

না, আমি এসব খাবো না।

ও ছুঁড়ে ফেলে দেয় লজেন্স দুটো। ঘাসের ওপর উড়ে আসে কাক। লাবনী হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ভাইয়া দেখো দেখো পাখি।

বল, কাক।

কাক পাখি। কাক পাখি তুমি লজেন্স খাও?

হ্যাঁ, কাকতো লজেন্স খাবেই। তুই চুপ করে থাক। তাহলে কাক লজেন্স খাবে।

লাবনী হাত-পা গুটিয়ে বসে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ভাইয়া দেখো আর একতা পাখি।

ওটার নাম শালিখ।

আয় আয় শালিখ।

আবুলের মনে হয় লাবনী পাখি পেয়ে মাকে ভুলেছে। ও কিছুক্ষণ মায়ের কথা আর মনে করবে না। আবুল পকেট থেকে এক মুঠি মুড়ি ঘাসের ওপর ছড়িয়ে দেয়। শালিখটা মুড়ি খুঁটে খায়। উড়ে আসে আর একটি শালিখ। দুটি হয়। উড়ে আসে আর একটি কাক। আর একটি শালিখ যোগ দেয় ওদের সঙ্গে। যোগ দেয় আর একটি কাকও। বাড়তে থাকে পাখি। দুটি চড়ুই আসে। আসে দুটি বুলবুলি।

আবুলের মনে হয় মা-হারা লাবনীর জন্য পাখিরা ভালোবাসা নিয়ে এসেছে।

লাবনী নিজেও এখন একটি পাখি। ও গুটিসুটি পায়ে পাখিদের দিকে এগিয়ে যায়। পাখিরা ওকে একটুও ভয় পায় না।

আবুল গাছের নিচে চিৎপাত শুয়ে পড়ে। একটি সুন্দর দৃশ্য দেখার আনন্দ ওর বুকের ভেতরটা ভরিয়ে রেখেছে। ও উপুড় হয়ে শুয়ে থুতনিটা ঘাসের ওপর রেখে লাবনী আর পাখির খেলা দেখতে থাকে। দৃশ্যটা থেকে ও নিজেকে আড়াল করতে চায় না। ও দেখতে পায় লাবনী হাতের পাতায় মুড়ি ধরে রেখেছে আর পাখিগুলো ওর হাত থেকে মুড়ি তুলে খাচ্ছে। খিলখিলিয়ে হাসছে লাবনী। তখন ওর দু'চোখ ভরে ঘুম নামে। তবু ও ঘুমুতে চায় না। সন্ত্রাসী বড় ভাইয়ের ভয়ে সারাক্ষণ ভীত থাকে। কে জানে কখন ও ওদের হাতে ধরা পড়ে যায়! ভয়ে গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসে ও নিজেকে লুকিয়ে ফেলে। এখন ও একটি ভিন্ন এলাকায় চলে এসেছে। এখানে কেউ ওকে চেনে না। তারপরও ভয় কাটে না। ওর মনে হয় লাবনীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে ও হয়তো বেঁচে যাবে। ও গাছের গুঁড়িতে হেলান গিয়ে উদাস হয়ে যায়। বুঝতে পারে ওর বেঁচে থাকার রঙ বারবারই বদলায়। আর যখনই বদলায় তখনই ওর সামনে নতুন রঙ ফুটে ওঠে। তারপরও আবুলের খুব মন খারাপ থাকে। লাবনীকে পাওয়ার আগে পর্যন্ত ওর যে জীবন ছিল সে জীবনের জন্য ওর দুঃখ হয়। আবার লাবনীকে পেয়ে ওর মনে আরেক ধরনের আতঙ্ক। ওদের হাত থেকে পালাতে পারবে তো? ওরা কি ওকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলবে? মৃত্যুর কথা মনে হতেই ও দু'হাতে মুখ ঢাকে। মনে পড়ে ইলিয়াসের কথা অনুযায়ী ও দশ থেকে পঞ্চাশ বার বোমা ও অস্ত্র বহন করেছে। তারপর একদিন অন্য সন্ত্রাসীর হাতে নিহত হয় ইলিয়াস। তখন অন্যরা ওকে লুকিয়ে রেখেছিল অনেকদিন। অন্ধকার ঘর, তালা আটকানো, সময়মতো এক থালা ভাত-ডাল-ভাজি, নুন-পেঁয়াজ-মরিচ, পানি, কখনো এক প্যাকেট সিগারেট। সারাদিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকা, নয়তো শুয়ে থাকা। ওহ্, সে এক অদ্ভুত সময় গেছে ওর জীবনে! সন্ত্রাসীরা পুলিশকে ঘুষ দিতো। সিগারেটের প্যাকেটে করে ঘুষের টাকা চালানো হতো। ও নিজেও কতবার কত কারণে টাকা পৌঁছে দিয়েছে। সেবার মাস দুয়েক পরে অন্ধকার ঘর থেকে ওকে বের করে দেয়া হয়েছিল। ও আবার পথের স্বাধীন ছেলে হয়েছিল। এমন বড় ধরনের ঘটনা ওর জীবনে আর ঘটেনি। এ জীবনে ওর আয় খারাপ ছিল না। বোমা বহনের জন্য পেয়েছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা, আন্দোলনের সময় মিছিলে বোমা ছোঁড়ার জন্য পেয়েছে দুইশ টাকা। পিস্তল বহনের জন্য পেয়েছে পঞ্চাশ থেকে দুইশ টাকা। একদিন ওর বড়ভাই পুলিশকে বলেছিল, পোলাপানরা সাহসী। এসব কাজ ভালো পারে। এরা বিশ্বাসীও। আর টাকা নিয়ে বেশি দর কষাকষি করে না। এদের নিয়ে কাজ করে আরাম পাই।

সন্ত্রাসী বড়ভাই ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, ভাবিস না বিশ্বাস করি বলে মাথায় তুলে রাখবো। এদিক-ওদিক করলে এক গুলিতে ফুটুস হয়ে যাবি। খবরদার পুলিশের সঙ্গে কোনো কথা বলবি না। বুঝলি?

চোখ গরম করা তাহের ভাইকে সেদিন ওর যমের মতো মনে হয়েছিল। এখনও তাহেরের চেহারা ওর সামনে ভেসে উঠলে শিউরে ওঠে আবুল। মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসলে দেখতে পায় লাবনী হাততালি দিচ্ছে। পাখিগুলো একে একে উড়ে যাচ্ছে। একটু পরে লাবনী দৌড়ে ওর কাছে আসে।

ভাইয়া, পাখি নাই।

উড়ে গেছে?

ও হেসে মাথা নাড়ে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কোলে। আবুলের মনে হয় লাবনী বুঝি মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে এলো। ও আর কাঁদবে না।

ভাইয়া বালি চলো।

বাড়ি? আবুলের কান্না পায়। ওদেরতো কোনো বাড়ি নেই। ঘুমুনোর জন্য জায়গা খুঁজে বের করতে হয়। কতদিন এভাবে কাটাতে হবে? একদিন লাবনী বড় হবে। তখন লাবনীকে কেমন করে পাহারায় রাখবে?

আবুল লাবনীকে বুকে জড়িয়ে হাঁটতে থাকে। ডাইনি বুড়ির কাছে লাবনীকে রাখবে। তারপর ও কাজ খুঁজবে। সন্ত্রাসী করে যে টাকা কামিয়েছিল সে টাকা লাবনীর জন্য খরচ করবে না। লাবনী ওর মজুরির টাকায় ভাত খাবে, স্কুলে যাবে। পুরো ব্যাপারটা আবুলের কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। একটু পরে ও বুঝতে পারে যে লাবনী ওর ঘাড়ের ওপর ঘুমিয়ে গেছে। ওর ঘাড়ই বুঝি লাবনীর বাড়ি। আবুলের মনে হয় লাবনীর তো কোনো বিছানা নেই। ওকে নিয়ে ও আজ পুরো শহরে হেঁটে বেড়াবে। যতক্ষণ লাবনীর ঘুম না ভাঙে ততক্ষণ।

ও যতক্ষণ হাঁটে ততক্ষণ ওর মনে হয় ওর কোনো দুঃখ নেই। ওর চারদিকে সবুজ আলো ছড়িয়ে আছে। ও বুঝে যায় যে ডাইনি ওকে আড়াল করে রেখেছে। ওর আর কোনো ভয় নেই। ও ইচ্ছেমতো সব জায়গায় যেতে পারবে। ও গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে যায়।

কতক্ষণ হেঁটেছে ও জানে না। কোন এলাকায় এসেছে তাও জানে না। শুধু শুনতে পায় ঝুমার আর্ত-চিৎকার।

বাঁচাও, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। ও মাগো–

ঝুমার কান্না শুনে চারদিক থেকে ছেলেমেয়েরা ছুটতে ছুটতে বাইরে আসে।

কি হয়েছে ঝুমার? ঝুমা কাঁদছে কেন?

আমাকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছে খালাআম্মা। আমার পিঠের চামড়া পুড়ে গেছে। আমার হাত পুড়ে গেছে। পা পুড়ে গেছে।

তুমি বেরিয়ে এসো।

আমাকে ঘরে আটকে রেখেছে।

আমরা এখন কি করবো?

চলো আমরা বাড়িটা ঘেরাও করি।

আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি মরে যাচ্ছি। আমি পানি খাবো, পানি। ও মাগো, মা–

আয়, সবাই।

মোমেনা চিৎকার করে সবাইকে ডাকে। ছেলেমেয়েরা কোনদিকে যাবে বুঝতে পারে না। মনে হয় চিৎকারটা চারদিক থেকে আসছে। একসময় ওরা থমকে দাঁড়ায়।

মোমেনা বলে, চল আমরা আগে থানায় যাই।

ঝুমার আর্ত-চিৎকার আবার দ্বিগুণ হয়ে ওঠে।

খালাআম্মা, খালাআম্মা আমি আর কাপ ভাঙবো না। কাপতো আমি ইচ্ছা করে ভাঙিনি। হঠাৎ করে হাত থেকে পড়ে গেছে। খালাগো আমাকে আর মারবেন না। আল্লাহর দোহাই লাগে আমাকে ছেড়ে দেন।

ছেলেমেয়েরা থমকে থাকে। তারপর শব্দ ধরে বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মোমেনা আবুলকে বলে, তুই থানা থেকে পুলিশ নিয়ে আয়।

আবুল লাবনীকে কাঁধে করে থানার দিকে চলে যায়।

মোমেনা বাড়ির গেটে লাথি দিয়ে দারোয়ানকে বলে, গেট খোলেন চাচা।

তুমি কে?

আমি ঝুমার বোন।

তোমার মতো ঝুমার বোন আছে বলে তো জানি না।

জানেন নাতো কি হয়েছে। দরজা খোলেন।

কেন দরজা খুলবো?

আমরা ভেতরে ঢুকবো।

কেন, কি দরকার তোমাদের?

ঝুমা যে কাঁদছে আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

না, আমিতো শুনতে পাচ্ছি না। কোথাও কেউ কাঁদছে না। তোমরা যাও।

সত্যি শুনতে পাচ্ছেন না?

না, না। দারোয়ান চোখ লাল করে তাকায়।

দাঁড়ান দেখাচ্ছি মজা। এই সবাই আয়।

শত শত ছেলেমেয়ে দারোয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কয়েকজন পড়ে যাওয়া দারোয়ানের গায়ের ওপর বসে থাকে। কেউ কেউ ওর হাত আর পা চেপে ধরে রাখে। বাকিরা ধাক্কা দিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। ঝুমার চিৎকার আর নাই। ও গোঁঙ্গাচ্ছে। বাড়ির গৃহিণী একসঙ্গে এতগুলো ছেলেমেয়ে দেখে তেড়ে ওঠে, তোমরা কেন ঢুকেছো?

ঝুমাকে উদ্ধার করতে ঢুকেছি।

তোমরা ঝুমার কে?

আমরা ঝুমার বোন।

আমরা ঝুমার ভাই।

ন্যাকামি। ঢং দেখাতে এসেছো। বের হও, বের হও বলছি। নইলে পুলিশে দেবো। আমি এখনই থানায় ফোন করবো।

ফোন করতে হবে না। আমাদের ভাইরা পুলিশ আনতে গেছে। এখনই পুলিশ আসবে।

কি বললে? গৃহকর্ত্রী চুপসে যায়। তারপর তেড়ে ওঠে বলে, ঝুমা একটা শয়তান মেয়ে। পাজির পা-ঝাড়া। রাতদিন দুষ্টুমী করে। চুরি করে খাবার খেয়ে ফেলে।

তাহলে আপনি কি ওকে খেতে দেন না?

কম খাবার খেয়ে ওর পেটে খিদে থাকে। নইলে ও চুরি করবে কেন?

আমরা ঝুমাকে দেখতে যাবো। ঝুমা কোথায়?

শোনা যায় ঝুমার আর্তনাদ। আমি এই ঘরে। আমাকে বাঁচাও। আমি মরে যাচ্ছি। মা, মাগো-

ছেলেমেয়েরা গৃহকর্ত্রীকে সরিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দরজায় বড় একটি তালা ঝোলানো। একজন ফিরে আসে গৃহকর্ত্রীর সামনে।

চাবি দিন। এক্ষুণি। নইলে–

নইলে কি?

লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলবো।

তোমাদের এত সাহস?

হ্যাঁ, সাহস। দিন, চাবি দিন।

দরজার গায়ে পা তুলে ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে বলে, চাবি দিন।

গৃহকর্ত্রী তাড়াতাড়ি কোমরে গুঁজে রাখা চাবি থেকে ঝুমাকে আটকে রাখা ঘরের তালার চাবিটি খুলে দেয়।

ওরা দরজা খুলে দেখতে পায় ঝুমা মেঝেতে পড়ে আছে। ওর জ্ঞান নেই। ওর হাত-পা-পিঠে পুড়িয়ে দেয়ার জন্য দগদগে ঘা। লাল হয়ে আছে। মোমেনাসহ কয়েকজন ঝুমাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসে।

তখন পুলিশের গাড়ির সঙ্গে আবুল এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। মোমেনা জ্ঞানহীন ঝুমাকে দেখিয়ে পুলিশকে বলে, দেখুন খুন্তি দিয়ে পুড়িয়েছে।

আমরা বিচার চাই।

আমরা বিচার চাই।

ঝুমা যদি মরে যায় তাহলে ফাঁসি চাই।

এই তোমরা থামো। আমরা দেখছি।

ওনাকে আগে গ্রেফতার করুন।

গৃহকর্ত্রীর হাতে হাতকড়া পরায় পুলিশ।

মোমেনা বলে, চল আমরা হাসপাতালে যাই। তারপরে আমরা থানায় যাবো। এই মহিলাকে জেলে ঢুকিয়ে ছাড়বো। চল। আয় আবুল।

সবুজ আলোয় ভরে যায় চারদিক। ছেলেমেয়েরা বুঝে যায় যে ডাইনি এসেছে ওদের কাছে। মোমেনা মৃদুস্বরে বলে, ডাইনি ঝুমা ভালো হয়ে যাবেতো?

হ্যাঁ, ভালো হবে। তবে অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে।

ওর সঙ্গে হাসপাতালে কে থাকবে ডাইনি? আমরা তো সবাই কাজ করি। কাজ না করলে আমরা খাবো কি?

তোদের এত চিন্তা করতে হবে না। তোরা যার যা কাজ করবি। এখন ওকে হাসপাতালে নিয়ে যা। তারপর কাগজপত্র নিয়ে থানায় যাবি।

ডাইনি তুই কি যাবি আমাদের সঙ্গে?

না। তোরা নিজেরা যা।

নিভে যায় সবুজ আলো।

আবুল বলে, আমার কাছে টাকা আছে। তোরা একটা মিশুকে উঠে পড় ওকে নিয়ে। আমি আর একটায় আসছি।

হাসপাতালে ঝুমাকে ভর্তি করে ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা থানায় আসে।

বিচার চাই।

ওরা থানা প্রাঙ্গণে জড়ো হয়।

নির্যাতনকারীর শাস্তি চাই।

আরে বাবা, এরাতো দেখি রাজনীতি শুরু করেছে।

একজন পুলিশ এগিয়ে এসে বলে, আসামীকেতো আমরা থানায় নিয়ে এসেছি। আমরা সব ব্যবস্থা করবো। তোমরা বাড়ি যাও।

যতদিন বিচার না হবে ততদিন আমরা রোজ থানায় আসব।

ঝুমার চিকিৎসার টাকা আদায় করতে হবে।

আচ্ছা, আচ্ছা সব হবে। তোমরা বাড়ি যাও।

তোমরাতো সব শিশুশ্রমিক। তোমাদেরকে কালকে কাজে যেতে হবে।

ও বাব্বা, আমাদের জন্য আপনার এত দরদ পুলিশ সাহেব।

দরদ হবে না কেন আমরা কি মানুষ না?

মানুষতো। মাঝে মাঝে যেন কেমন করেন। লাঠি দিয়ে দুটো বাড়ি দিয়ে দেন।

গাল ফুলিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে হীরন বলে।

নিজের জামা খুলে পিঠ দেখিয়ে বলে, এই দেখেন আপনাদের ডাণ্ডার বাড়ি খেয়ে পিঠ কেটে গিয়েছিল। দুই-তিন মাস হাসপাতালে ছিলাম।

আর কখনো এমন হবে না। তোমরা বাড়ি যাও।

ওই মহিলাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। ঝুমা যে কষ্ট পেয়েছে তাকে তেমন কষ্ট দিতে হবে।

তাকেও খুন্তির ছ্যাঁকা দিতে হবে। তারও চুল কেটে দিতে হবে। এসব কিছু না হলে আমরা এই থানার মাঠে শুয়ে থাকব। আমরা কিছু খাব না। আমাদেরকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারবে না।

কোনো বিচার না হলে আমরা সবাই জীবন দেবো।

আমাদেরতো কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সেজন্য আমাদের মরে যেতেও ভয় নাই।

তখন কয়েকজন পুলিশ কয়েক প্যাকেট বিস্কুট ও পানি নিয়ে আসে। বলে, তোমাদের খিদে পেয়েছে। তোমরা বিস্কুট আর পানি খাও।

ছেলেমেয়েরা বিস্কুট খায়। পানি খায়। মাথার ওপর প্রখর রোদ। তৃষ্ণায় ওদের বুক ফেটে যাচ্ছিলো। ওরা পানি খাওয়ার পর বুঝতে পারে যে আকাশে

মেঘ ঘনিয়েছে। বাতাসে শীতল ভাব। ওই মেঘ সূর্য ঢেকে দিলে ওরা ছায়া পাবে। ছায়া পেলে ওরা ঝুমার পুড়ে যাওয়া শরীরের জন্য স্বস্তি পাবে। ঝুমার যন্ত্রণা কমবে। ও আরাম পারে। ঝুমা ছটফট না করে ঘুমিয়ে পড়বে।

সবুজ আলো ওদেরকে ঢেকে ফেললে ওরা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ছড়িয়ে পড়ে যে যার বাড়ির পথে। কাল কাজ করতে হবে। মোমেনা মৃদুস্বরে ডাকে, ডাইনি।

বল, আমিতো তোদের সঙ্গে আছি।

আমরা চাই না আমাদের কেউ কষ্ট পাক।

তোরা না চাইলে তোদের কথা অন্যরা শুনবে কেন? এসব ঘটতেই থাকবে। ঝুমা ভালো হয়ে যাবে। ও ভালো হলে আমরা চাঁদের দেশে যাবো।

চাঁদের দেশে? কি বলছিস তুই?

হ্যাঁ রে সত্যি। চাঁদের বুড়ি ডট কম থেকে আমি ইমেল পেয়েছি।

কোথায় পাঠিয়েছে মেইল?

ডাইনি বুড়ি ডট কম ঠিকানায়।

কি মজা, হুররে।

ছেলেমেয়েরা পথের যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে চিৎকার করে।

আমরা সবাই চাঁদের দেশে যাবো– হুররে। ডাইনি তুই লিখে দে যে আমরা হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যাবো। আমাদের খাওয়াতে পারবেতো চাঁদের বুড়ি?

আকলিমা সবুজ হাসি ছড়িয়ে বলে, চাঁদের বুড়ি লিখেছে তার কাছে পান্তা ভাতের একটা হাঁড়ি আছে, সঙ্গে ইলিশ মাছের টুকরো ভাজা। ওই হাঁড়ির ভাত কোনোদিন ফুরোয় না।

সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে বলে, সত্যি? ডাইনি তুই ঠিক বলছিস তো?

একদম ঠিক। তোরা কি কখনো আমার কাছ থেকে মিথ্যা কথা শুনেছিস?

না, না। ওদের চিৎকারে গমগম করে এলাকা।

আমরা কবে যাবো ডাইনি?

চাঁদের বুড়ি বলেছে যেদিন জ্যোৎস্নায় আমাদের জায়গাটা ভরে যাবে, আকাশের তারারা আমাদের মাথার উপর নেমে আসবে, তারাগুলো ফুলকির মতো জ্বলবে আর নিভবে তখন চাঁদের দেশ থেকে ভেলা পাঠাবে চাঁদের বুড়ি। একটা ভেলাতে আমরা সবাই যাবো।

আমরা কেমন করে সবাই একসঙ্গে হবো ডাইনি? আমরা কেউ যদি অনেক দূরে থাকি?

আমি তোদেরকে জড়ো করে নেবো। কেউ বাদ পড়বি না।

লাবনী কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি ঝুমা আপুকে ছাড়া চাঁদের দেথে দাব না।

আবুল ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমরা সবাই ঝুমাকে নিয়ে যাবো সোনা।

থিকতো?

হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

ঝুমা আপুকে সুন্দর দামা কিনে দিও ভাইয়া।

হ্যাঁ, সুন্দর জামা কিনে দেবো ঝুমাকে, তোকেও দেবো।

লাবনী খিলখিল করে হেসে হাততালি দেয়।

ওরা দেখতে পায় সবুজ আলো মিলিয়ে গেছে। ওরা যে যার মতো বাড়ি যাচ্ছে। মাথার ওপর নরম রোদ ভাসছে। ছেলেমেয়েদের মনে হয় ওরা টাকা জোগাড় করে ঝুমার জন্য নতুন জামা কিনবে, আপেল কিনবে, দুধ কিনবে, মুরগি কিনবে আর আইসক্রিম কিনবে। ঝুমা খুব খুশি হবে। বলবে, তোমরা আমাকে এত ভালোবাসো!

ওরা বলবে, বাসি, বাসি। আমরা ভালোবাসতে শিখেছি।

যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় ঝুমা সেদিন ঝকঝকে জ্যোৎস্না দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা। বুঝতে পারে একটু পরেই বোধহয় চাঁদের বুড়ির ভেলা এসে যাবে ওদের জন্য। ওরা নাচে-গানে মেতে ওঠে। ডাইনি সবুজ আলো ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। ওরা দেখতে পায় তারাগুলো আগুনের ফুলকির মতো জ্বলছে আর নিভছে– নিভছে আর জ্বলছে– তারাগুলো উড়ে আসছে। তারার পেছনে চমৎকার রঙিন ভেলা।

ভেলা এসে মাটিতে নামলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ভেলায় উঠে পড়ে। চাঁদের বুড়ি এসএমএস পাঠায় ডাইনিকে। লেখা আছে, স্বাগতম সোনার ছেলেমেয়েরা।

ভেলা যখন উড়ে যায় তখন ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা ভাবে, ইস কি সুন্দর চাঁদনি রাত!

আর একজন বলে, এমন চাঁদনি রাত আমি আগে দেখিনি।

মোমেনার মায়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ, আমার মনে হচ্ছে এ বছর আমাদের নদীগুলো ইলিশ মাছে ভরে যাবে।

মনে হয় এবার ধানও ফলবে বেশি।

ঠিক বলেছো। আমাদের অভাব থাকবে না।

ছেলেমেয়েগুলোকে পেট ভরে খেতে দিতে পারবো।

তখন হা-হা করে হাসতে হাসতে আবুলের মা বলে, এমন চাঁদনি রাতেই সুদিন আসে। এ বছর থেকেই বোধহয় আমাদের ছেলে-মেয়েগুলোর শিশুশ্রম বন্ধ হবে। ওরা ছোট বয়সেই বড় হয়ে যাবে না।

লাবনীর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি বোধহয় আমার লাবনীকে খুঁজে পাবো। ওকে রেখে আমি আর কোথাও পালিয়ে যাবো না।

লাবনীর মায়ের চোখের পানিতে একটা নদী হয়। সে নদীর নাম আন্ধার মানিক।

ভেলা এসে চাঁদে পৌঁছায়।

চাঁদের বুড়ি রেশমি সুতোর মালা পরিয়ে দেয় সবার গলায়। নীল আর্মস্ট্রং প্রত্যেকের হাতে একটি করে রঙিন নুড়ি দিয়ে বলে, স্বাগতম।

ছেলেমেয়েরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গান করে।

মোমেনা চাঁদের বুড়িকে একটা জামদানি শাড়ি দিয়ে বলে, এটা তোমার জন্য বুড়িমা।

চাঁদের বুড়ি জামদানিটা জড়িয়ে ধরে গন্ধ শোঁকে। বলে, আমি ঠিক দেশের গন্ধ পাচ্ছি।

আবুল নীলকে খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবি দিয়ে বলে, তোমার জন্য আমাদের ভালোবাসা নীল। তোমার জন্য ঢাকার বাখরখানি আর ছানার জিলাপি এনেছি। নাও, খাও।

নীল হাতে নিতে নিতে বলে, থ্যাঙ্কু তোমাদের। আমাদের বন্ধুদের গান শেষ হলে আমরা সবাই একসঙ্গে খাবো।

সবার খাওয়া হবে না। আমরা তো বেশি আনিনি।

নীল হাসতে হাসতে আবুলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, ভেবো না একটুও। চাঁদের বুড়ির হাতে এই প্যাকেটটা দিলে হাজার হাজার বাখরখানি আমরা পাবো।

আবুল চোখ কপালে তুলে বলে, তাই!

হ্যাঁ তাই। নীল লম্বা করে টেনে কথা বলে। তারপর দু'হাত বাড়িয়ে লাবনীকে কোলে নিয়ে বলে, ও আমাদের চাঁদের মেয়ে। ও হলো আমাদের সবার নাতনি। আমি ওকে ডানা লাগিয়ে দেবো। ও আকাশে উড়ে বেড়াবে।

হ্যাঁ, আমি উলতে চাই। আমাকে দানা দাও।

দেবো, দেবো। ডানা দেবো সোনামণিকে।

নীল হা-হা করে হাসে। লাবনীকে ঘাড়ে নিয়ে বলে, চলো সবাই।

কোথায় যাবো আমরা?

যে ভেলাটায় করে তুমি পৃথিবী থেকে এখানে এসেছিলে।

হ্যাঁ, সেই ভেলাটা। মহাকাশ যানের মডিউলের নাম ছিল কলম্বিয়া, আর লুনার মডিউলের নাম ঈগল।

ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে বলে, আমরা ঈগল চিনি। আমরা বাংলাদেশে ঈগল পাখি দেখেছি।

বাহ্, দারুণ!

ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করতে করতে চাঁদের ভেলা ঈগল দেখতে যায়। যেতে যেতে তারা ঈগলকে দূর থেকে দেখে একছুটে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নীল ওদের মতো ছুটতে পারে না। লাবনীকে ঘাড়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটে। লাবনী বলে, চাঁদের দেশে কি আমার মা আথে?

আমরা খুঁজে দেখবো আছে কিনা।

তুমি আমার মাকে খুঁজে দাও নীল।

নীল চুপ করে থাকে। ও কোথায় খুঁজবে লাবনীর মাকে। খোঁজা কি সহজ কাজ? কিন্তু এটাওতো সত্যি লাবনীর মা কেন অভাবের জন্য ওর জীবন থেকে দূরে থাকবে? চাঁদের বুড়ি কি পারবে ওর মাকে খুঁজে বের করতে? কিংবা ডাইনি বুড়ি? নীল চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পায় দুই বুড়ি পাথরের উপরে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছে। ওর মনে হয় ক্যামেরা থাকলে এমন সুন্দর দৃশ্যের ছবি তুলে রাখতে পারতো। ওর মনে হয়, এই দুই বুড়িকে নিয়ে দেশে গেলে জাদুঘরে রাখা যেতো। মানুষেরা অবাক হয়ে দেখতো দুই বুড়িকে। দেশের মানুষ ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতো নীল আর্মস্ট্রং আমাদের মিউজিয়ামের দুটো আইটেম বাড়িয়েছে। দারুণ হয়েছে।

তখন চাঁদের বুড়ি কঠিন স্বরে হাঁক দেয়, নীল, এসব কি ভাবছিস? ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। তোর বাপ বুশ এসেও তোকে বাঁচাতে পারবে না। কেবল দখলের চেষ্টা।

ক্ষমা করে দাও চাঁদের বুড়ি। আর কখনো এমন চিন্তা হবে না আমার।

চাঁদের বুড়ি রাগত স্বরে বলে, আমার মনে হয় না তুই ঠিক হবি। তোকে মানুষ করা কঠিন।

তোমার পায়ে ধরি বুড়িমা।

পায়ে ধরতে হবে না। তোকে আমি আমার রেশমি সুতো দিয়ে বাঁধলাম। পৃথিবীর যেখানেই তুই থাকিস না কেন এমন কথা শুনলে এই সুতো দিয়ে তোর কান টেনে ধরবো।

এত দূর থেকে কান টেনে ধরলে আমার কানতো ছিঁড়ে যাবে বুড়িমা।

তোর কান ছিঁড়ে যাওয়াই উচিত।

তুমি এত রেগে গেলে কেন। আমিতো কাউকে একথা বলিনি।

অন্যরা না শুনলে কি হবে আমিতো শুনেছি।

ঠিক আছে তুমি যা শাস্তি দেবে আমি তাই মাথা পেতে নেবো। আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অন্যরা কেউ কিছু শুনতে না পেলে কি হবে তোর ভাবনাগুলো খুব খারাপ। এই ভাবনা দিয়ে তোরা পুরো পৃথিবী দখল করতে চাস।

তুমি ভীষণ রেগে গেছো। কি করলে আমাকে ক্ষমা করবে তা আমাকে বলে দিও।

চাঁদের বুড়ি ওর কথার জবাব দেয় না। লাবনী ওর চুল ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, তোমার কি হয়েথে নীল? দাচ্ছো না কেন?

নীল দেখতে পায় চাঁদের বুড়ি ওর পা জোড়া মাটিতে আটকে দিয়েছে। ও নড়তে পারছে না। লজ্জায় সেকথা লাবনীকে বলতেও পারছে না। লাবনী ওর চুল ধরে ঝাঁকালে বলে, আমি ব্যথা পাচ্ছি লাবনী।

আমি ভাইয়ার কাথে দাবো। ভাইয়া–

ওর কান্নায় চমকে ওঠে আবুল। নীল দাঁড়িয়ে আছে কেন বুঝতে না পেরে দৌড়ে কাছে আসে।

কি হয়েছে নীল?

মাটিতে আমার পা আটকে গেছে। আমি হাঁটতে পারছি না।

ওমা, দেখি দেখি। তোমার পা দেখি পাথরের মতো শক্ত। তোমাকে বোধহয় কেউ জাদু করেছে নীল।

নীল মৃদু হাসে।

আবুল অবাক হয়ে বলে, তুমি দেখি হাসছো!

আমাকে কেউ জাদু করেনি। চাঁদের বুড়ি আমাকে শাস্তি দিয়েছে।

শাস্তি? কেন?

সেসব আমি বলতে পারবো না। তুমি বুড়িমার কাছে যাও। আমাকে মাফ করে দিতে বলো।

লাবনী আবুলকে দেখে কান্না থামিয়েছিল। ওর দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বলে, ভাইয়া আমাকে নাও।

কিন্তু লম্বা নীলের ঘাড় থেকে লাবনীকে নামানো যায় না। আবুল দেখতে পায় নীলের পুরো শরীর শক্ত হয়ে আছে। নিচু হতে না পারলে লাবনীকেও নামানো যাচ্ছে না। ও তখন এক ছুটে চাঁদের বুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

চাঁদের বুড়ির পায়ের বুড়ো আঙুলটা নাড়িয়ে দিয়ে বলে, বুড়িমা আমি নীলের হয়ে মাফ চাইতে এসেছি।

ওকে মাফ করা হবে না।

তাহলে লাবনীর কি হবে? ওকে নামাবো কি করে? ও কি অপরাধ করেছে বুড়িমা?

ও যদি বলে, লাবনীকে নিয়ে ওদের দেশের জাদুঘরে একটা খাঁচায় রাখবে, তাহলে তুই কি করবি?

ঘুষি মেরে ওর নাক উড়িয়ে দেবো। মাথা ফাটিয়ে ফেলবো। আর ওর কঙ্কালটা নিয়ে ঢাকার জাদুঘরে রেখে দেবো।

তাহলে ঠিক আছে যা। ওকে আমি মাফ করে দিলাম।

সত্যি মাফ করে দিয়েছো?

ওই দেখ ও হাঁটতে পারছে।

আবুল তাকিয়ে দেখে চাঁদের ভেলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নীল। ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়ছে। লাবনীও দু'হাত নাড়িয়ে ওকে ডাকছে। নীল ওর ছোট্ট দুটি পা চেপে ধরে আছে। কি সুন্দর লাগছে দু'জনকে। আবুল আকলিমাকে বলে, ডাইনি দেখো ওদেরকে কি সুন্দর লাগছে। আমি ভাবছি নীলকে ঢাকায় নিয়ে যাবো।

ঢাকায় নিয়ে যাবি? বলিস কি?

কেন ও এমন কি লাটসাহেব হয়েছে?

ও রকেটে করে চাঁদের দেশে এসেছে। তুই ওকে ঘুমুতে দিবি কোথায়?

কোথায় আবার দেবো? আমার সঙ্গে ফুটপাথে থাকবে। ও দেখবে আমরা কেমন করে থাকি।

তোর লজ্জা করবে না নিজেদের গরিবি দেখাতে?

তুমি যে কি বলো না ডাইনি। আমার একটুও লজ্জা করবে না।

চাঁদের বুড়ি বলে, ও ঠিকই বলেছে। ওরা দেশটা চুষে খায় বলেতো নীলের দেশের এত পাওয়ার। এমন অনেক দেশ ওরা চোষে।

থ্যাঙ্কু বুড়িমা। আমি গেলাম।

আবুল ছুটে যায় নীলের কাছে। ওর কাঁধ থেকে লাবনীকে নামিয়ে নিজের ঘাড়ে নেয়। দু'জনে 'কলম্বিয়া' মডিউলের কাছে এসে দাঁড়ায়। নীল বলে, এই দেখো এটা একটা সিলিকন ডিস্ক। এতে খোদাই করা আছে পৃথিবীর তিয়াত্তরটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের শুভেচ্ছা বার্তা।

দেখি, দেখি।

ছেলেমেয়েরা হুড়োহুড়ি শুরু করলে দূর থেকে ভেসে আসে চাঁদের বুড়ির কণ্ঠ। বলে, তোরা শান্ত হয়ে দাঁড়া ছেলেমেয়েরা। আমি ওটাকে অনেক বড় করে দিচ্ছি। তোরা মন ভরে দেখ।

ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে সিলিকন ডিস্ক আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে– আস্তে আস্তে আলো ঝলকায়। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে।

নীল বলে, এই দেখো শান্তির প্রতীক সোনালি অলিভ গাছের ডাল। আমরা এই ডালটা পুঁতে রেখেছিলাম পৃথিবীর মানুষের ভালোবাসার স্মারক হিসেবে। বুড়িমা ওদেরকে এই ডালটা বড় করে দেখাও।

সোনালি জলপাই গাছের ডাল আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। আবার আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিতে দিতে বলে, নীল আমরা তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে ঢাকায় নিয়ে যাবো।

নীল অবাক হয়ে বলে, ঢাকা? ঢাকা কোথায়?

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী নীল।

ও আচ্ছা। আমি খুব দুঃখিত।

তুমি ভীষণ বোকা নীল।

আমরা তোমার দেশের কথা অনেক বেশি জানি।

নীল লজ্জা পায়। তারপর নিজের লজ্জা আড়াল করার জন্য বলে, আমি ঠিক করেছি এই কলম্বিয়ায় করে আমি তোমাদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে যাবো। দেখে আসবো তোমাদের ঢাকা শহর।

সত্যি? হুররে।

মোমেনা চিৎকার করে বলে, ডাইনি শুনতে পাচ্ছিস নীলের কথা?

আকলিমা মৃদু হেসে বলে, পাচ্ছি।

তাহলে কবে যাবো আমরা?

যাওয়ার দিন ঠিক করার আগে একটা কাজ আছে।

কি কাজ?

আগে আমরা দু'জনে ঠিক করে নেই। তারপর তোদেরকে বলবো।

বাব্বা, তুমি চাঁদের বুড়ির সঙ্গে এত জমে গেছো?

তোদের বুড়িমা যে ঢাকার জামদানি শাড়ি পরেছে তাতো তোরা দেখিসনি। দেখবি আয়।

হুররে, চাঁদের বুড়ি আজ আমাদের জামদানি-রানী।

হৈ-হৈ করে ছেলেমেয়েরা চাঁদের বুড়িকে ঘিরে ধরে।

আমরা এখন গান গাইবো।

নাচবো।

তোমাদেরকেও আমাদের সঙ্গে নাচতে হবে, গাইতে হবে।

হ্যাঁ, নাচবো-গাইবো এ আর এমন কি কথা। এ তো খুশির কথা।

আমরাও তোদের সঙ্গে আনন্দ করতে চাইরে ছেলেমেয়েরা।

তাহলে এসো।

ছেলেমেয়েরা হাত ধরাধরি করে নাচতে শুরু করে। ওরা চাঁদের বুড়ি আর আকলিমাকে ওদের বৃত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। নীল দাঁড়িয়ে থাকে বৃত্তের

বাইরে। ছেলেমেয়েরা ওর হাত ধরেনি। ওকে বৃত্তের মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। তাই ওর খুব মন খারাপ। তারপরও বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের গানের সঙ্গে হাততালি দেয়। শিস বাজায়। নিজে নিজে নাচে। চাঁদের বুড়ি ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, এভাবেই ভালো থাক। তোকে তোর দেশের প্রেসিডেন্টের বোঝা টানতে হচ্ছে রে ছেলে। শয়তান লোকেরা এভাবে অন্যদের দুঃখ দেয়। কি আর করবি!

নীল মাথা নাড়ে। কথা বলে না। ছেলেমেয়েদের গানে ওর মনোযোগ চলে যায়।

ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে বলে, হৈ-হৈ রৈ-রৈ। চাঁদের বুড়ির ঘর কই॥

একজন বলে, বুড়িমা তোমার ঘর কোথায়?

চাঁদের বুড়ি নীল সুতোর আলো ছড়িয়ে নাচতে থাকে। নাচতে নাচতে গানের সুরে বলে, চাঁদের বুড়ির ঘর পদ্মা নদীর পাড়ে।

হৈ-হৈ রৈ-রৈ। চাঁদের বুড়ির মা কই॥

বুড়িমা তোমার মা কোথায়?

মাতো আমার হারিয়ে গেছে সেই ছোটবেলায়।

তাহলে তুমি কি আমাদের লাবনী?

হ্যাঁ তাই। মা নাই, বাবা নাই, আমার আছে চাঁদের দেশ–

হৈ-হৈ রৈ-রৈ। চাঁদের বুড়ির বয়স কত?

কোটি কোটি বছর–

হা-হা করে হাসে চাঁদের বুড়ি।

চাঁদের বুড়ির এত বয়স, চাঁদের বুড়ি খায় কি?

চাঁদের আলো, চাঁদের আলো।

আমরাও চাঁদের আলো খাবো।

তোদের জন্য পান্তা-ইলিশ।

পান্তা-ইলিশ তুমিও খাও।

পান্তা-ইলিশ খেলে আমার বয়স কোটি বছর হবে না। আমি মরে যাবো।

না, না তুমি মরে যাও এটা আমরা চাই না। তুমি কোটি কোটি বছর বেঁচে থাকো।

চাঁদের বুড়ি, চাঁদের আলো॥ নীল সুতোয় গলার মালা॥ হৈ-হৈ রৈ-রৈ। চাঁদের বুড়ির মরণ নাই।

হা-হা করে হাসতে থাকে সবাই। তখন ডাইনি সবুজ আলো ছড়িয়ে দিয়ে বলে, দেখো দেখো কারা যেন আসছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ কারা যেন আসছে। কারা ওরা?

ওমা, ওইতো আমার মা। মোমেনা ছুটে যায় মায়ের দিকে।

ওইতো আমার মা। লাবনী চেঁচিয়ে ওঠে। ছুটে যায় মায়ের দিকে।

আমার মাও এসেছে। ঝুমা দৌড় দেয়।

আকলিমা আবুলের দিকে তাকিয়ে বলে, আবুল তোর মাও এসেছে।

কোনটা আমার মা? মায়ের চেহারা আমার মনে নেই।

ওই যে সবুজ শাড়ি পরে আছে ওইটা। তোর মায়ের ঠিকই তোর চেহারা মনে আছে।

আবুল মা, মা বলে ছুটে যায়।

ছেলেমেয়েরা দেখতে পায় সবার মা এসেছে। যাদের মা নেই শুধু ওরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদের চোখে জল। আকলিমা ওদের ওপর সবুজ আলো ছড়িয়ে দিয়ে বলে, কাঁদিস না, সবার মা সবসময় থাকে না। চাঁদের বুড়ি বললো না ছোটবেলায় তার মা হারিয়ে গেছে।

তোমার মা কোথায় ডাইনি?

আমার মায়ের কথা আমার মনে নেই। আমার দুদিন বয়সে মা মরে গেছে। আমার খালা আমাকে পেলেছে। আমি তোদের দলে আছি।

বুড়িমাও আমাদের দলে আছে।

হ্যাঁ, আমিও তোদের দলে। তাহলে চল যে মায়েরা এসেছে তাদেরকে নিয়ে আসি।

কি খেতে দেবে?

গুড়-মুড়ি।

আর কি?

ডাবের পানি। আমরা সবাই মিলে খাবো। খেয়েদেয়ে আমরা গল্প করবো। আমি সবাইকে পদ্মা নদীর গল্প শোনাবো।

ততোক্ষণে ছেলেমেয়েরা মায়েদেরকে হাত ধরে নিয়ে আসে।

আমরা কীভাবে এখানে এলাম?

মায়েদের কণ্ঠে প্রশ্ন।

চাঁদের বুড়ি হাসতে হাসতে বলে, আমি আপনাদের এখানে নিয়ে এসেছি। আমার জাদুর ভেলায় চড়ে আপনারা এখানে এসেছেন।

আমাদের মায়েদেরকে খেতে দাও বুড়িমা।

তোমরা মায়েদের হাতে এক টুকরো পাথর দাও সোনামণিরা। দেখবে মায়েদের পাথরের থালায় ভাত আর ইলিশে ভরে গেছে। মায়েরা যতক্ষণ খেতে পারবে ততক্ষণ থালা ভরতেই থাকবে সোনামণিরা।

হি-হি করে হাসতে হাসতে মোমেনা বলে, আমাদের মায়েরা রাক্ষস না বুড়িমা।

আমি কি তাই বলেছি রে মেয়ে? অতিথিরা যেন লজ্জায় কম না খায় সেই কথাই বলেছি।

তোমার মন খারাপ করে দিলাম?

আমার কি তোদের মতো মন আছে রে?

জানি তো তোমার মনটা রেশমি সুতোয় বাঁধা। গেলাম মায়ের জন্য একটা সুন্দর পাথর খুঁজতে।

ছেলেমেয়েরা চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে। যে যার মতো সুন্দর সুন্দর পাথর খুঁজে আনে। মায়েরা পাথরের থালা পেয়ে ভীষণ খুশি। হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের থালা পান্তা-ইলিশে ভরে যায়। কি সুন্দর ঘ্রাণ। ইলিশের ঘ্রাণে ম ম করে চারদিক। মায়েরা মনোযোগ দিয়ে ভাত খায়। এক থালা ভাত খেয়ে তারা বুঝতে পারে তাদের পেট ঢুপঢুপ করছে। খুব খুশি হয়ে চাঁদের বুড়িকে বলে, ধন্যবাদ আপনাকে।

চাঁদের বুড়ি ঠোঁট উল্টে বলে, শুনতে ভালো লাগলো না।

আমরা কি ভুল বলেছি?

ভুল না। ভুল বলবেন কেন?

তাহলে–

মায়েরা খানিকটা অবাক হয়, খানিকটা অভিমান হয় তাদের।

ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে বলে, এমন শুকনো কথা বুড়িমার ভালো লাগে না। তোমরা বলো, চাঁদের বুড়ি ফুলের কলি। যা খাওয়ালো মাথায় তুলি।

পুরো চাঁদের দেশে পংক্তি দুটো গান হয়ে যায়। সবাই মিলে গান গায়। গান থামলে সবুজ আলো ছড়িয়ে দিয়ে আকলিমা বলে, এবার যাবার সময় হলো আমাদের।

নীল আর্মস্ট্রং হাত উঁচিয়ে বলে, আমার ঈগল জাহাজ রেডি। আমি আমেরিকায় নামার আগে বাংলাদেশে নামবো। সুন্দর বাংলাদেশ না দেখে আমি দেশে ফিরবো না।

হুররে, নীলকে আমরা পদ্মা নদীতে নামিয়ে দেবো। ইলিশ মাছের সঙ্গে সাঁতার কাটবে নীল।

ঠিক, ঠিক বলেছো। পদ্মা নদীর পানিতে গা না ভিজিয়ে আমি দেশে ফিরবো নাকি।

আর কি করবে?

আমি নারকেল গাছে উঠে ডাব পাড়বো।

আর কি?

তোমাদের কৃষকের সঙ্গে হাল চাষ করবো।

তোমাকে আমরা গরু বানিয়ে দেবো।

হা-হা করে হাসে ছেলেমেয়েরা।

আহা, ওকে তোরা এমন করে কথা বলছিস কেন? চুপ কর সবাই।

লাবনী ওর কোলে উঠে বলে, তুমি আমার সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলবে নীল?

খেলবো।

কুতকুত করতে পারবে?

হ্যাঁ, পারবো।

আবার সবাই হো-হো করে হাসে।

চাঁদের বুড়ি বলে, তুই এমন লক্ষ্মী হয়ে গেলি কেন রে ছেলে?

বুড়িমা এদেরকে পেয়ে আমার ভীষণ ভালো লাগছে।

তুই আবার ওখানে গিয়ে ওদের হলুদ শর্ষে ক্ষেতটা নিয়ে যেতে চাইবি নাতো?

ছিঃ ছিঃ বুড়িমা, আমাকে আর লজ্জা দিও না।

মনে থাকবেতো? অন্যের দেশের যা কিছু সুন্দর তা নিয়ে নিজের দেশের গুদামে ভরতে চাইবি না।

তোমার কথা আমি জীবনে ভুলবো না বুড়িমা। তোমার যত্নের কথা ভুলবো না, অন্যায়কে চিনিয়ে দেয়ার কথা ভুলবো না। তোমার ভালোবাসার কথা ভুলবো না। জয় বাংলা বুড়িমা।

ছেলেমেয়েরাও চিৎকার করে বলে, জয় বাংলা বুড়িমা।

তুমি আমাদেরকে মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছো, সেজন্য তোমাকে ভালোবাসা।

তোদেরকেও আমার অনেক ভালোবাসা সোনামণিরা। আমার রেশমি সুতোটা উড়িয়ে দিয়ে তোদেরকে আমি বিদায় জানাবো। তোরা ভেলায় গিয়ে উঠ।

ছেলেমেয়েরা নীলকে সঙ্গে নিয়ে ঈগল ভেলায় চড়ে বসে। অতটুকু ভেলার মধ্যে শত শত ছেলেমেয়ে– কারো বসার অসুবিধা হয় না। যে কেউ শুয়েও থাকতে পারে। হাঁটারও জায়গা আছে।

আকলিমা চাঁদের বুড়িকে বলে, আসি বোন।

ছেলেমেয়েদের দেখে রেখো বোন।

আমার কি সাধ্য!

আকলিমার ঠোঁটে বেদনার হাসি।

যার যতটুকু সাধ্য আছে সেটাইতো কাজে লাগাতে হয়। চলো বোনেরা।

মায়েদের সঙ্গে নিয়ে আকলিমা ভেলায় গিয়ে ওঠে। চাঁদের বুড়ি রেশমি আলো ছড়িয়ে দেয়। রেশমি আলোতে ভরে যায় পৃথিবীর বুক।

বাংলাদেশের শহরের ছেলেমেয়েরা মাঠে জড়ো হয়। বলে, আজকে নীল চাঁদ দেখা যাচ্ছে। দেখো কি সুন্দর ঝকঝকে আকাশ।

পৃথিবীতে সুদিন আসবে। এমন আলোই তো আমরা চাই যেন আমাদের বস্তির ছেলেমেয়ে মন্টু-রিমার জীবনে আলো ফোটে। এই দেশটা যে কেমন বুঝি না।

কি বলতে চাস তুই?

সরকার সব ছেলেমেয়েকে একরকম আলো দেয় না কেন?

সত্যি। ঠিকই তো।

একদম ঠিক।

কেউ ভালো থাকবে, কেউ থাকবে না, এটা হবে না।

এর জন্য আমাদের কি করার আছে?

অকস্মাৎ সবাই চুপ করে যায়।

একজন বলে, আমরা আমাদের বাবা-মাকে বলবো তারা যেন সবার জন্য একটা কিছু করে।

আমি বলবো ওদেরকে স্কুলে পাঠাতে।

আমি বলবো ওদেরকে কাপড় দিতে।

আমি বলবো ওদেরকে ওষুধ দিতে।

আমরা ওদের জন্য কিছু করতে পারলে আমাদের দেশটা খুব সুন্দর হবে।

দেখো দেখো আকাশে একটা ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে।

কি সুন্দর রেশমি আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

দেখে মনে হচ্ছে ভেলায় অনেক ছেলেমেয়ে আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

মনে হচ্ছে ভেলাটা আমাদের এখানেই নামবে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

আয়, আমরাও ওদের দিকে হাত নেড়ে স্বাগত জানাই। ওরা আমাদের দেশ দেখতে আসুক।

ওরা কি চাঁদের দেশের ছেলেমেয়ে?

তাই হবে বোধহয়।

সব ছেলেমেয়ে ওপরের দিকে হাত নাড়তে থাকে।

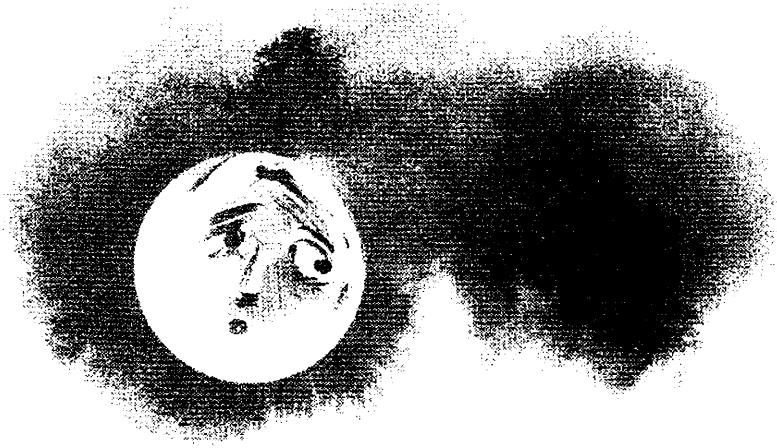

আবুল নীলকে বলে, দেখো নীল আমরা আমাদের দেশের উপরে চলে এসেছি।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি নামার আগে উপর থেকে তোমাদের দেশটা দেখবো।

বেশ হবে। তাই করো।

কোনদিকে আগে যাবো?

তোমার যেদিকে খুশি যাও। আমি তোমাকে পুরো দেশটা দেখিয়ে দেবো।

ওই দেখো ওটা বঙ্গোপসাগর।

বাহ্ কি সুন্দর নীল পানি। দারুণ লাগছে দেখতে।

দেখো, দেখো ওটা আমাদের সুন্দরবন। এই বনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে।

ওই ওই যে বাঘ। ডোরাকাটা বাঘ। নদীতে কুমিরও দেখতে পাচ্ছি। বাহ্ কি সুন্দর হরিণের দল দৌড়ে বেড়াচ্ছে। এই বনটার কি যেন একটা বিশেষত্ব আছে আবুল?

এটা অনেক বড় ম্যানগ্রোভ বন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ম্যানগ্রোভ বন। এই বনের কথা আমি জানি। আমি শুনেছি। আর তোমাদের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের কথা কে না জানে!

আবুল হাসতে হাসতে বলে, দেখো দেখো। মন্দিরটা দেখো।

বাহ্ অপূর্ব! কি সুন্দর কারুকাজ।

এটা হলো কান্তজীর মন্দির। যে কারুকাজের কথা বলছো এটাকে বলা হয় টেরাকোটা। আমাদের শিল্পীরা এই টেরাকোটা বানায়।

কীভাবে বানায় আমি তা দেখবো আবুল।

আমি তোমাকে নিয়ে যাবো ওদের গ্রামে। দেখো দেখো কি সুন্দর মসজিদ।

বাহ্, অপূর্ব। অনেক পুরনো কালের মসজিদ নিশ্চয়!

হ্যাঁ, অনেক পুরনো। এই মসজিদের নাম ষাটগম্বুজ মসজিদ। এর ষাটটা গম্বুজ আছে।

ওয়াও, নীলের কণ্ঠে বিস্ময়।

ওই দেখো আমাদের পদ্মা। যে নদীর ইলিশ তুমি খেয়েছো। আর এই নদীটাকে তুমি তোমার দেশে নিতে চেয়েছিলে।

তুমি কিছু মনে কোর না বন্ধু।

পাশ থেকে মোমেনা বলে, তোমাদের এত লোভ কেন? তোমার প্রেসিডেন্টকে বলবে ইরাক আক্রমণ করে কাজটা ঠিক করেনি।

আমি তোমাদের কথা অবশ্যই আমার প্রেসিডেন্টকে বলবো। বলবো প্রেসিডেন্টের খারাপ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কত লজ্জা পেতে হয়েছে আমাকে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো বন্ধুরা।

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, আমাদের কাছে তোমার ক্ষমা চাইতে হবে না বন্ধু। তোমাকে আমরা প্রাণের বন্ধু করে নিয়েছি।

থ্যাঙ্কু বন্ধুরা। আরে আরে ওটা কি? মাঠজুড়ে সোনালি ফুল ফুটে আছে দেখছি।

হা-হা করে হাসতে থাকে ছেলেমেয়েরা।

নীল বোকার মতো তাকিয়ে বলে, তোমরা হাসছো কেন?

ওগুলো আমাদের ধান ক্ষেত। ক্ষেতে ক্ষেতে ধান পেকেছে। সোনালি শীষ দেখতে পেয়েছো তুমি।

কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আমি শুনেছি তোমাদের দেশে অনেকরকম ধান হয়।

এক সময় আমাদের দেশে চার হাজারের বেশি রকমের ধান জন্মাতো। এখন অবশ্য কমে গেছে।

যে ভাত আমি চাঁদের বুড়িমার কাছে খেয়েছি তার নাম কি?

কালিজিরা।

হুররে, কালিজিরার ভাত খেয়েছি। আমি পৃথিবীতে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে কি ধানের ভাত খাবো আবুল?

যদিও আমরা খেতে পাই না, কিন্তু তোমাকে আমি কাটারীভোগ চালের ভাত খেতে দেবো। দেখবে খুব মজা লাগবে।

থ্যাঙ্কু, বন্ধুরা।

আমরা ঢাকার কাছাকাছি এসে গেছি নীল। আমাদেরকে নামার জন্য তৈরি হতে হবে।

একটা মনুমেন্ট দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা।

ওটা আমাদের স্মৃতিসৌধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধ করা হয়েছে। তোমার ভেলাটা চারপাশ দিয়ে ঘোরাও দেখবে এই সৌধের কতরকম মাত্রা।

সত্যিতো, দারুণ। আমি তোমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছি। তোমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছো। ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছে। শেখ মুজিব তোমাদের জাতির জনক। নিউইয়র্কে যখন জর্জ হ্যারিসন আর রবিশঙ্কর কনসার্ট করেছিল আমি কনসার্ট শুনতে গিয়েছিলাম। আমি যে টিকেট কেটে কনসার্ট শুনেছিলাম সেটা ছিল তোমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমার কন্ট্রিবিউশন।

গ্রেট। তুমি আমাদের হিরো নীল। দেখো আমাদের স্মৃতিসৌধের ওপরটা।

চমৎকার।

আবুল চেঁচিয়ে বলে, ডাইনি তুমি স্মৃতিসৌধের ওপর সবুজ আলো ছড়িয়ে দাও।

আকলিমা তাই করে। পুরো স্মৃতিসৌধ এলাকা মায়াবী আলোয় অপরূপ দেখায়। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নতুনভাবে স্মৃতিসৌধ দেখে। কতবারইতো দেখেছে, কিন্তু আজকের দেখাটা একদম অন্যরকম। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে, নীল দেখো, দেখো আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ।

আকলিমা স্মৃতিসৌধ চত্বরে পুরো বাংলাদেশকে ছোট আকারে ছবির মতো বিছিয়ে দেয়। নীল আর্মস্ট্রং তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেমেয়েরা নীলের মগ্নতা ভাঙাতে চায় না। তারপর মোমেনা ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, তোমার ভেলাটা এখানে নামাও। আমরা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে নামবো। আমাদের স্মৃতিসৌধে তুমি ফুল দেবে নীল।

নীল তন্ময়তা ভেঙে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ওর ঘোর কেটে যায়। ও চেঁচিয়ে বলে, দারুণ বলেছো। আমি তোমাদের শহীদদের স্মরণ করে অবশ্যই ফুল দেবো।

আমরাও তোমার সঙ্গে ফুল দেবো।

অবশ্যই দেবে। তোমাদেরকেইতো চিরদিন শহীদদের স্মরণ করতে হবে।

মায়েরা সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে, আমরাও ফুল দেবো। আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছি। আমাদের দুঃখ ফুলে ফুলে ভরে দিতে চাই।

মায়েদের কণ্ঠস্বর শুনে ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ হয়ে যায়। মোমেনা আকলিমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ডাইনি আমাদের হাজার ফুল চাই।

আকলিমা ঘাড় কাত করে। স্মৃতিসৌধ চত্বর ভরে যায় ফুলে। চারদিকে ফুলের গন্ধ ম-ম করে।

নীল তার ভেলাটা স্মৃতিসৌধের চত্বরে নামিয়ে দেয়। অবাক হয়ে লক্ষ্য করে দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলো কেমন ধীর পায়ে নেমে যাচ্ছে। প্রত্যেকে একটি ফুল হাতে নিয়ে সারি করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ওরা নেমে যাওয়ার পরে মায়েরা নামে।

সবার শেষে নামে নীল আর্মস্ট্রং।

ও দু'হাত বোঝাই করে ফুল তুলে নেয়।

ফুলগুলো স্মৃতিসৌধের পাদদেশে রাখার পরে নীল জোরে জোরে বলে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদরা তোমরা আমার দেশের মানুষের ভালোবাসা নাও। আমার দেশের প্রেসিডেন্ট ৭১ সালে তোমাদেরকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধিতা করেছিল। সেজন্য আমি ক্ষমা চাই। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ভালোবাসা তোমাদের পক্ষেই ছিল। তোমরা গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে ভুলে যেও না বন্ধুরা।

কথা শেষ করে ভেলায় উঠে পড়ে নীল। বলে, বিদায় বন্ধুরা।

সে কি নীল, আমাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করবে না?

আমারতো সময় নেই। আমাকে দেশে ফিরতে হবে।

বিদায়।

তোমার সঙ্গে আর কি দেখা হবে?

নিশ্চয় হবে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও।

বিদায় বন্ধু নীল আর্মস্ট্রং। বিদায়।

ছেলেমেয়েরা হাত নাড়ে। মায়েরাও।

উপর থেকে নীল দেখতে পায় বাংলাদেশের পতাকা হাতে নিয়ে ছেলেমেয়েরা রাস্তা দিয়ে মিছিল করে চলে যাচ্ছে। ওরা শান্ত। গম্ভীর। যেন দেশটাকে ঘাড়ের ওপর তুলে নিয়েছে। আকলিমা সবুজ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে ওদের ওপর। ওদের পেছনে মায়েদের হাতেও পতাকা।

গুণগত শিক্ষা উন্নত জীবন
সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)
পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত
বিক্রির জন্য নয়।